তৃতীয় অধ্যায়

বিংশ শতকের অন্ত্যলগ্নের বাংলা কবিতায় কবিমানস ও লোকমানস

[১]

বিংশ শতকের অন্ত্যলগ্নের বাংলা কবিতায় কবিমানস ও লোকমানসের প্রসঙ্গটি শুরু করা যেতে পারে ওপর বাংলার কবিদের দিয়ে। ওপার বাংলার দুই প্রথিতযশা কবি শামসুর রহমান এবং আল মাহমুদ বাংলা কবিতার সর্বাধুনিক ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেছিলেন। লোকজ গ্রামীন জীবনকেন্দ্রিক কবি আল মাহমুদ। শামসুর রহমান নাগরিক কবি হলেও নগরকেন্দ্রিকতা তাঁর কাব্যের একটি দিক মাত্র। অসংখ্য কবিতায় তিনি লোকচেতনার যে চকিত আভাস দেন তা লোক বিশ্বাসের নিগড়েই বাঁধা।

কবি আল মাহমুদের মনের গহনে অবিরাম খেলা করে লোক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশের গার্হস্থজীবন। লোকজীবনের দুঃখ-দারিদ্র-অপ্রেম কবিকে বার বার নিঃসঙ্গ করে তোলে। কিন্তু তবুও আল মাহমুদ লোকজীবন ছেড়ে পলাতক নন। লোক-জীবন যন্ত্রণার মধ্যেই তিনি আত্মমুক্তির সন্ধানে প্রত্যয়ী। তাই তাঁর কবিতায় বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য-বিধৃত লোকজীবনকে খুঁজে পাই। আদিম জন-জীবনের কথাও ভোলেন নি কবি আল মাহমুদ। বাংলার শ্রমজীবী কৌমজীবন যে কতবার, কতভাবে তাঁর কবিতায় জায়গা করে নিয়েছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এই লোকমনস্ক শিল্পী লোকজীবন ও দেশজ প্রকৃতি থেকে অসংখ্য উপাদান সংগ্রহ করে কাব্য-কায়া নির্মাণ করেছেন। 'চরের পাখি', 'গন্ধ ভরা ঘাস, 'দড়ি-ছেড়া বাছুর', 'কুড়োনো হাঁসের ডিম' তাঁর কবিতায় লোকাভরণ সৃষ্টি করেছে এবং কবিতাগুলি লোক-ঐতিহ্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

বাংলাদেশের অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কাব্যচর্চায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশেরই কবিতা লিটর ম্যাগাজিনকে আশ্রয় করে প্রকাশ পেত। অস্তিত্বের অন্বেষাই ছিল সেই সময়ের কবিতার প্রতিপাদ্য। এই অস্তিত্ব-অন্বেষু কবিতাবলিকে

শেকড় অভিলাষী চেতনার কবিতা বলে অভিহিত করা যায় । এই সময়ের কবিতার মর্মবস্তু ছিল দেশজ মানুষ ও জাতীয় সংহতি - যার শেকড় প্রোথিত ছিল মৃত্তিকায়, স্বদেশের মাটির মধ্যে । এ সময়ে নাগরিক কবিতার মনিহর্মের তলায়ও ছিল গাঢ়-গভীর মৃত্তিকা - যেখান থেকে সৃষ্টি হয়েছিল চেতনলোকের রূপরস । লোক ঐতিহ্যের সদর্থক জাগরণকেই দ্যোতিত করেছিল এ যুগের কবিতা । খোন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পাদিত 'এক বিংশ', এজাজ ইউসুফি সম্পাদিত 'লিরিক', সরকার আশরাফ সম্পাদিত 'নিসর্গ', কমরুল হুদা সম্পাদিত 'দ্রষ্টব্য', জাফর আহমেদ সম্পাদিত 'আড্ডারু', শামি হোসেন সম্পাদিত 'গ্রন্থি', হেনরি স্বপন সম্পাদিত 'জীবনানন্দ', সরকার আমিন সম্পাদিত 'মঙ্গল সন্ধ্যা', লিয়াকত শাহ ফরিদী সম্পাদিত 'নিব্যাজ', প্রিয়ক রসিদ সম্পাদিত 'সৃষ্টি', মোস্তাক আহমেদ দ্বীন সম্পাদিত 'বিকাশ' রেজাউল করিম চৌধুরী সম্পাদিত 'অর্কেষ্ট্রা', হাফিজ রসিদ খান সম্পাদিত 'পুষ্পক রথ' প্রভৃতি লিটল ম্যাগাজিনে একালের কবিরা গ্রাম বাংলার অগুন্তি মানুষের হতাশা, চাপাপড়া বেদনার অনুভূতি ও মন্ময় দ্রোহকে কাব্যভাষায় প্রতিস্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ।

লোকবীক্ষক এইসব কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন আজিজুর রহমান আজিজ, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, আলমুজাহিদী, আবু হোসেন শাহরিয়ার, গোলাম কিবরিয়া, সুনীল সাইফুল্লাহ, ব্রাত্য রাইসু, মুজিব ইরম, জাহার আহমেদ রাশেদ, শামীম কবির, মঈন চৌধুরী প্রমুখ ।

এইসব কবিদের কবিতায় লোকচেতনার পরিবাহী আধার হয়েছে কবিচেতনা । এঁদের কবিতায় লোকজগতের স্বরূপ উদঘাটিত হয় নানাভাবে । কখনো লোকযাত্রায়, কখনো দেশজ সীমানায়, কখনো লোককথায়, কখনো প্রবাদ-প্রবচনে, কখনো লোকশ্রুতি ও লোকবিস্ময়ে, কখনো লোকাচারের উল্লেখে কবিতা হয়েছে শিল্পময় । এযুগের অনেক কবিই লোকচেতনাকে সার্থকভাবে কাব্যভাষায় শিল্পিত রূপ দিয়েছেন । সুনীল সাইফুল্লা লিখেছেন, ''চলে যাবার সীমারেখায় / আর একটু ভালো করে দেখে নিই আকাশ, সূর্যাস্ত, সুর, নিথর পানাপুকুর ।'' মাহবুব কবিরের কবিতায় বাংলাদেশের হাওর কতই জীবন্ত, ''সমুদ্রের সবচেয়ে ছোট মেয়ে এই হাওর । / আষাঢ়-ভাসা জল আর হু হু ভাটি

হাওয়ায় বুক ডুবে আছে।'' মুজিব ইরম লোক-জগৎ থেকে তুলে আনেন তাঁর কবিতার শব্দবন্ধ, ''আমাদের যে খাল পুঁটি আর পাবদার দখলে থাকবার কথা / সেইসব মাছ পিছলে গেলে বঁড়শি বাওয়া নিরর্থক।'' কবিদৃষ্টির সাথে লোকজীবনের যথার্থ মিলন ঘটাতে পেরেছেন ওপার বাংলার অনেক কবি। লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবন ধারাকে তাঁরা কেউই অস্বীকার করেন নি। করলে অবশ্যই এঁদের কবিতা নিষ্প্রাণ হত। যাঁরা মহানগরের জীবনের দোসর, যাঁদের কবিতায় নগরকেন্দ্রিক জীবন মুখ্য হয়েছে বারবার, তাঁরাও পারেন নি লোকজীবনকে এড়িয়ে যেতে। শামসুর রহমান পারেননি, বুদ্ধদেব বসুও পারেন নি। কারণ ঐ একটাই, কবিমনকে সবচেয়ে বেশি উদ্দীপ্ত করে 'লোকলোর'।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় যুগপৎ প্রগতি ও পশ্চাৎ-গতির ছাপ পড়েছে। কবিমানস ও লোকমানস - উভয়ই এর জন্য দায়ি। প্রাচীনপন্থী বিশ্বাস ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি একই সঙ্গে ধরা পড়ে এই সময়ের কবিতায়। অভিজ্ঞতার প্রতিটি ক্ষেত্রে আছে কবি-মানসের দ্বিধা-সংশয়, বহুদর্শিতার প্রশংসনীয় মৌলিকতা। এসময়ের কবিদের অনেকেই ছিলেন কাল সচেতন। কবির কাল কবি-মানসে গোচরে-অগোচরে কাজ করে। একাজ রবীন্দ্রনাথের 'শিল্পকাজ'। অবশ্য এই কাজ দেবালয়ের শুচিতা অর্জন করতে পারেনি অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে। তবুও মানব সমাজে মানবিক মূল্যবোধের অপসারণ ও গভীর জীবনবোধের অনুপস্থিতি সে সময়ের কবিদের ক্লিষ্ট করেছিল সন্দেহ নেই। আবার এরই পাশাপাশি একাধিক কবির কাব্যে জীবন অন্বেষণের একমুখিতা ও একাগ্রতাও অনুধাবন করা যায়। সহজে লোকজীবনের দিকে ফিরে যাবার ও তাকে ফিরে পাবার একটা ব্যাকুলতাও এ সময়ের কবিদের মধ্যে দুর্নিরীক্ষ নয়।

[২]

লোক ইতিহাস তার স্থানিক অবস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কবিতার জন্ম দেয় যে কবি মন তার নির্দিষ্ট অবস্থান কবিতা সৃষ্টি ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে কাজ করে। সুতরাং প্রথমেই ইউরোপ অথবা আমেরিকার ইতিহাসের কাঠামোয় ফেলে যদি দু-বাংলার কবিদের বিচার করি তাহলে তা হবে একদেশদর্শী। এ প্রসঙ্গে দুটি ভাবকল্পের কথা অনিবার্যভাবেই এসে যায়। ১. আধুনিক ২. উত্তর আধুনিক।

আধুনিক বলি, আর উত্তর আধুনিকই বলি-ব্যাপার আসলে স্থানিক। ইউরোপীয় কবিদের মানস-গঠন বাঙালি কবিদের থেকে 'স্থানিক' কারণেই স্বতন্ত্র। তাই অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতার চরিত্র বৈশিষ্ট্য আধুনিক-উত্তরাধুনিক হয়েও কবির প্রতিস্ব নির্মাণে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যকে সংস্কৃতি দিয়ে প্রথমে বিচার করতে হয় - প্রাক্ বিচার বীক্ষণের ব্যাপারেও সেই একই কথা-স্থানিক সংস্কৃতির বিশেষ বীজ থেকে মহীরুহের সম্ভাবনা ও সৃষ্টি।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় আধুনিক বাংলা কবিতায় আধুনিকতার ক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিকতার বীজ উপ্ত করেন অ্যালান গিনসবার্গ, যখন তিনি কলকাতায় প্রথম পা রাখেন। এই সময় থেকেই তাৎক্ষণিক কবিতা (Instant poem) লেখার প্রবণতা দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে এর প্রতি কবিদের আগ্রহ বাড়তে থাকে। এঁরা অস্বীকার করেন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, মান্যতা দেন মূল স্রোতের যা বিকল্প তাকেই। আজও পোষ্ট-মডার্ণ কবিতা আন্দোলন স্তিমিত বা স্তব্ধ হয়নি। সুতরাং ১৯৭০ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা কবিতায় এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার ভুবন ধীরে ধীরে প্রবেশ করে তাকে অ-স্বাভাবিক করেছে, তার চলার গতিকে দ্রুততর করেছে।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতায় রয়েছে সঞ্চার-পথ। সেই কারণেই তাতে বহুমাত্রিক বিষয়ও অর্থযুক্ত হয়েছে। বহু রং, বিচিত্র বর্ণের খেলায় এই বিশেষ সময়ের কবিতা পাঠে পাঠক কবিতাকে বিনির্মাণ করেন।

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে আধুনিক বাংলা কবিতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলেই সেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবির আলোচনাই প্রথম ও শেষ কথা। এছাড়াও আধুনিক কবিতার যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য - বিষয়কেন্দ্র, নির্দিষ্ট অনুক্রম, একরৈখিকতা, এক কৌণিকতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, বাস্তবতা, নিটোল সূচনা ও সমাপ্তি, ট্যাবু ও প্রতীক ব্যবহার, বিশেষ মতাদর্শ, লোকজ তথা মানবিক চেতনার প্রতিফলন, একাকীকত্ব - সে সব কিছুর প্রাসঙ্গিক আলোচনা রয়েছে সপ্তাধ্যায় ব্যাপী।

বিশ শতকের শেষ পাদ থেকে আধুনিকতার স্বরান্তর ঘটেছিল উত্তর আধুনিকতায়।

উত্তর আধুনিক কবিরা নানা কারণে আধুনিক কবিদের থেকে স্বতন্ত্র । এই স্বাতন্ত্র্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ -

(১) উত্তর আধুনিক কবিতায় কোনো নির্দিষ্ট বিষয় কেন্দ্র, নির্দিষ্ট ভাবনা কেন্দ্র অথবা নির্দিষ্ট অনুক্রম থাকবে না ।

(২) কবিতাগুলি হবে বহুকৌণিক এবং বহুত্ববাদী ।

(৩) উত্তর আধুনিক কবিতা যেন রাইজোমেটিক -, গুচ্ছমূল উদ্ভিদ । এতে ব্যক্তির অনুপস্থিত থাকার কথা । সরলবর্গীয় বৃক্ষের শৃঙ্খলা গুচ্ছমূল উদ্ভিদে নেই । সরলবৃক্ষ আধিপত্যবাদী, যেমন এককেন্দ্রিক বিশ্বে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ । চারপাশে অন্য সবাইকে ধ্বংস করে, শোষণ করে নিজের মাথা তুলতে চায় সবার শীর্ষে । এই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বিদ্রোহের ঝড় উঠেছে, খোদ মার্কিন মুল্লুক থেকে ক্যাটেরিনার মতো ঝড় উঠেছে । জ্ঞানের অসংখ্য মুক্তাঞ্চল গড়ে উঠেছে । যার উজ্জ্বল উদাহরণ ইন্টারনেটে অসংখ্য ওয়েব সাইট ।[১]

(৪) উত্তর আধুনিক কবিরা জীবন ও পরিবেশের এমন সব জানা-অজানা উপাদান কবিতায় ব্যবহার করবেন যেখানে ট্যাবুর কোনো প্রশ্নই থাকবে না এবং বাস্তবের যথাযত অনুকরণও ঘটবে না । রিয়ালিটি নয়, হাইপার রিয়ালিটির দ্বারা জীবন জগতের অবিনির্মাণ -এ প্রয়াসী হন পোস্ট মডার্ণ কবিরা ।

(৫) ইমেজ তৈরির ঝোঁক পোস্ট-মডার্ণ কবিদের মধ্যে থাকে না বললেই হয় । বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নের বাংলা কবিতায় কবিমানস ও লোকমানসের আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতার এই আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । কারণ, ১৯৭০ থেকে ২০০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রচিত বাংলা কবিতায় আধুনিকতার লক্ষণ ও চিহ্ন যতখানি স্পষ্ট, উত্তর-আধুনিকতার বৈশিস্ট্যাবলি ততখানি স্বচ্ছ ও সাবলীল নয় ।

বিংশ শতাব্দীর অন্ত্যলগ্নে দু-বাংলার কবিরা আমাদের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিয়ে গেছেন বিশেষ ভাবনা ও মনোগতির যাদুদণ্ড স্পর্শে । কবি-মানস যুক্তিজালকে যেমন অস্বীকার করেনি, তেমনি মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকেও উপেক্ষা করেনি ।

স্বাভাবিক প্রেরণা ও তাৎক্ষণিক অনুভূতির সহজাত উপলব্ধি দ্বারা কবিরা লোকমানসের আবিস্কারে ছিলেন তৎপর । আর এই কারণেই তাঁরা নিসর্গ প্রকৃতি, গ্রামজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে কবিতার সঞ্চারপথ সৃষ্টিতে ছিলেন আগ্রহী । মাটির বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়েই নয়ের দশকে কবি সনৎ বসু 'এই সময়, আমার দর্পণে রূপ' কবিতায় লিখেছেন -

"অস্তিত্বের গভীর থেকে উঠে আসে যে বোধ
রুক্ষমাটির সঙ্গে প্রাত্যহিক ঘর্ষণে জন্ম নেয় যে উত্তাপ
আমাকে নিয়ত সতেজ রাখে ।"

মূল্যবোধের কাছে প্রতিদিন হেরে যেতে যেতেও ঝাড়গ্রামের শালবন আর আলোছায়ার রহস্যময় প্রভাবে নয়ের দশকে কবি সুকোমল বসু আমাদের শোনান সেই সাম্ভাব্য ভবিষ্যতের 'অনিন্দ্য শষ্যের গান', 'যদি ক্ষণিক মুহূর্তগুলি মেঘ হয়ে, জল হয়ে বুকের কাছে নেমে আসে ।'

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের নয়ের দশকে দু-বাংলার কবি মানসে ক্ষোভ, অক্রোশ আর প্রতিবাদের পাশাপাশি যুক্ত হয়েছিল স্বপ্ন দেখার প্রবণতা । কবি চন্দন আচার্য তাঁর 'হে প্রিয়, বাঙ্ময় ঐক্য ও শান্তি' (১৯৯০) কাব্যের 'যেদিন দেখবো' কবিতায় নিজের কবি মানসকে তুলে ধরেছেন লোকমানসের মৃত্তিকায়-

" যেদিন দেখবো আমাদের মাটি
আমাদের শিশু এখানে সাজায় নন্দন কানন
যেদিন দেখবো যুদ্ধ নামক শব্দের সঙ্গে
তাদের কখনো আর পরিচয় নেই
সেইদিন আমিও শান্তির মহাউৎসবে
পতাকা উড়িয়ে মিছিলে সামিল হব ।"

আলোক সোমের কবি-মানসে লোক-মানসের জীবন যন্ত্রণার ছবি গভীর অনুভবময়তায় যথাযথ ফুটে ওঠে । দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও গভীর মমত্ববোধে উদ্দীপ্ত কবি লেখেন-

"বাঁক ঘুরতেই দেখি সটান শ্রমিক আজো হাঁটে
রোদ পিঠে লাগে অধিশ্রী বিদায় ।"[২]

মল্লিকা সেন গুপ্তের কবি-মানস মানবীয় বিপন্নতায় ব্যথাহত, আবহমান নারী-পুরুষদের উদ্দেশ্যে নারীর দুঃখ-যন্ত্রণার ইতিকথা মল্লিকা সেনগুপ্ত এইভাবে লোকমানসে বিস্তার করতে চান -

"আবহমানের নারী ও পুরুষ
গোলাপ এবং ভোমরা
মানবীর এই বিষন্নতায়
পাশে দাঁড়ালে না তোমরা ।"[৩]

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের আটের দশকের কবি বিপুল চক্রবর্তীর কবি-মানস 'বেদনার লাল নিয়ে' জেগে থাকে জীবনের পাশে । তাই মে দিবসে যন্ত্রণাহত কবি-হৃদয়ের অনুভব হার্দ্য উচ্চারণে লোক-হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় এই ভাবে -

"ঘন সবুজ তরমুজের মতো আমার কবিতা
মাটি মেখে জেগে থাকে । মাঠের শিয়রে
লাল আবির ওড়াচ্ছে যারা উৎসবে, ওড়াক -
বুকের ভিতর বেদনার লাল নিয়ে
আমার কবিতা থাক জীবনে পিপাসার পাশে ।"[৪]

বলা বাহুল্য, কবিতা মননধর্মী শিল্প । তাই ইন্দ্রিয়ময় বাস্তব জগতের প্রবৃত্তিময় জীবন ধারণে অভ্যস্ত লোকসমাজ থেকেই কবিরা শিক্ষা অর্জিত শীলিত মননের সাহায্যেই ছেঁকে তোলেন নানা উপাদান - যা শুধু কাব্য-কায়াকে বৈভব-মণ্ডিত করেনা, কাব্যাত্মাকেও সমুজ্জ্বল করে ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিমানসে মূল্যবোধের প্রতি সংশয় ও নৈরাশ্যবোধের যে তীব্রতা তা এত সর্বগ্রাসী আকারে বিগত যুগসমূহে দেখা দেয়নি । তাই অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকীয় কবি-মানসের নিরাশাবোধের চেহারা অন্যান্য যুগের তুলনায় স্বতন্ত্র - যাতে

রাজতন্ত্র অথবা সমাজতন্ত্র নয়, বণিকতন্ত্রের প্রভাব পুষ্ট মধ্যবিত্তীয় বুদ্ধিজীবির মনোভাব লালিত হয়েছে।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের বাংলা কবিতার প্রথাগত দশকওয়ারি মানচিত্রে বহুবর্ণময় ও বহুমাত্রিক বিশিষ্ট আত্ম-স্বাতন্ত্রবাদী মানসিকতা নিয়ে পরিক্রমা করেছেন কবি ভাস্কর চক্রবর্তী ও দেবারতি মিত্র। দশকভিত্তিক পাঠ ও বিচারের বিধি বাদ দিলেও সময়ের ক্যানভাসে তাঁরা খুব কাছাকাছি অবস্থানে। কবি-মানসের প্রকাশভঙ্গিমায় তাঁরা অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী। ভাস্করের 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা'-র পাশাপাশি শোনা গিয়েছিল দেবারতির 'অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজে'। সেই থেকে পেরিয়ে আসা তিরিশটি বছরের লোকজীবন-ভিত্তিক কত না আলো-অন্ধকার, আবরণ উন্মোচনের নিভৃত স্রোতগুলি চিত্রিত হয়ে আছে এই দুই কবির কাব্য-ভাবনায়। এক শান্ত বিষন্নতায় ভরে থাকে ভাস্করের আশ্চর্য গভীর সব আত্মমগ্ন উচ্চারণ। নিবিড় আবেগে যাপিত লোক-জীবনের দিনরাত, মান-অভিমান কত বিচিত্র বাক্-প্রতিমার অনুচ্চকিত লাবণ্যে খেলা করে যায় ভাস্করের এই পংক্তিমালায় -

"রাত্রির আকাশ থেকে
ঝরে পড়ছে নক্ষত্র,
শব্দ নেই, শুধু মানুষ
মাদুর পেতে শুয়ে রয়েছে দাওয়ায়।"[৫]

১৯৭১ সালে, তাঁর যৌবন-তাড়িত বছরগুলিতে জীবনের বিপন্নতার মধ্যে ঘুরতে থাকা ভাস্কর প্রতিকারহীন বেঁচে থাকার বেদনা আভাসিত করেছিলেন 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' কাব্যের পাতায় পাতায়। এই কাব্যের পাতায় ধ্বনিত হয়েছে বীতরাগ, 'আমাদের স্বর্গ নেই।' তবে ভাস্করের কবিতায় যে জীবনের প্রতি আস্থা ফিরে পাবার ইশারা ছিল না এমন নয়-

"আমার ভুলগুলো আজ পরিস্কারভাবে বুঝতে পারি আমি
সন্ধেবেলা / হাঁটতে হাঁটতে ঐ বাড়ি ফিরে চলেছে মানুষ
শুকনো গাছটায় / দেখি, আবার শুরু করেছে

পাখিরা-শোনো, সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়নি / সমস্ত
কিছুই শেষ হয়ে যায় নি আমাদের ।''[৬]

দেবারতি মিত্রর কবি-মানসের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর কবিতায় । কবিতাগুলির নিবিড় পাঠের পাশাপাশি পড়ে নিতে ইচ্ছে করে তাঁর কবিতা বিষয়ক কিছু কথা । 'কবিতা সমগ্র'-এর ভূমিকায় তিনি বলেছেন, ''কবিতা নিয়ে আমি কিছু করতে পারি না, করতে চাইনা, শুধু পৌঁছতে চাই সেই সমুদ্রের কিনারায় যার একদিকে জীবন ও শিল্প, অন্য দিকে শুন্যতা-যেখানে কল্পনা মুহুর্মুহু নিজেকে সৃষ্টি করে চলে । ... যাবতীয় অনুভূতি, উপলব্ধি, স্বপ্ন, কল্পনা, মনন ও অভিজ্ঞতাকে, আমার সারা জীবনকে, কবিতায় উজাড় করে দিতে চাই, এ যেন একটা ছোট কাচের গ্লাসে সুদূর বিশাল সমুদ্রকে ধরে দেবার সাধ, এই অসম্ভব কি কোনও দিন সম্ভব হবে ।''[৭] এর উত্তর দেওয়া যায় এইভাবে, জীবন সমুদ্র যেভাবে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তাঁর কবিতায়, তার বহুমাত্রিক ক্রীড়া যেভাবে বাস্তব-পরাবাস্তবের আলোছায়ায় তীব্রভাবে উন্মোচিত হয় তাঁর ব্যতিক্রমী কাব্যভাষার জটিল দ্যুতিময় স্তর-স্তরান্তরে, তাতে করে মনে হয় একান্তভাবে কবিতার কাছে হাত পেতে থাকা এ কবিকে কবিতা কিছুতেই ফিরিয়ে দেবেনা । শ্রেষ্ঠ কবিতায় দেবারতি যখন বলেন, ''নদীতে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার গয়নার মতো'' বহমান সময় তখন তীব্রভাবে উন্মোচিত হয় তাঁর কাল জ্ঞাপক গূঢ় চেতনা । এক আটপৌরে গার্হস্থ্যের নিভৃত গোপন কোনে বসে একান্ত অনুভবে গাছ-ফুল-নদী-পাখি-পাহাড় ইত্যাদির গল্প বলেন দেবারতি । তাঁর অনুভাবী নারীসত্তা সক্রিয় হয় এইধরনের পংক্তি রচনার মধ্য দিয়ে, ''আমি সিঁড়িতে পা রাখতেই বাড়িটা পাখনা ঝেড়ে বালি হাঁসের মতো উড়তে শুরু করল ।'' (গতিঃ জঙ্গল কাটুল) ।

কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় দেখেছিলেন বিংশ শতকের অষ্টম দশকের উত্তাল দিনগুলি । তিনি প্রাণপণে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন সেই অস্থির পরিপার্শ্ব থেকে, স্থিত হতে চেয়েছিলেন প্রেমমিশ্রিত বিষাদের মধ্যে । 'তাঁর কাব্যসংগ্রহে'র তৃতীয় খন্ডে দেখি, নির্যাতিত লোকজীবনের প্রতিবিধিৎসায় তিনি লিখে চলেছেন সহজ সাধারণ জীবনের এক রূপ । প্রেম, বিষাদ এবং বিপ্লবকে তিনি বুঝতে চেয়েছেন অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের

'উন্মাদনার সময়' অতিক্রান্ত হবার পর। 'কাব্যসংগ্রহ' (৩য় খণ্ড)-এর প্রবেশক কবিতাতেই তার স্পষ্ট পরিচয় তিনি রেখেছেন-

> "কবি তো উলঙ্গ, একা, মাথার উপরে ঝড়বৃষ্টির আকাশ
> হিমসম্প্রপাত, কঠিন রোদ্দুর
> মানুষের খুব কাছে ঘাসের উপরে তার উপবেশনের সিংহাসন
> তার কোনো প্রজা নেই, আছে দুঃখী মানুষের বিষন্ন উত্তাপ
> ঘরবাড়ি।"

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবি-মানসের পরিচয় পাই তাঁর একটি উক্তিতে, "দীর্ঘ কবিতাকে যখন মাধ্যমরূপে নিয়েছি তখনই আমার মধ্যে আশ্চর্য আবেগ স্ফুর্ত হতে চেয়েছে, আবার মনে হয়েছে, আমার একটানা দুঃখকষ্টে পরিপূর্ণ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রবাহকে খন্ড কবিতায় ধরে রাখা যাচ্ছে না। দীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট কবিতা নির্মাণের প্রথম শর্ত থিম নির্বাচন। থিমটির থাকবে নিয়মিত অখণ্ড সম্ভাবনার কথা। তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা অগুন্তি বীজরাশি, যাদের আছে জীবন্ত এক একটি বৃক্ষ হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি।"[৮] এখানে যে চেতনা প্রবাহের কথা কবি বলতে চেয়েছেন তা এমন এক কাঠামোভিত্তিক যাতে সমকাল ধ্বনিত হয়ে ওঠে। সমকালকে স্বীকার করেই পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের কবি-মানস মহাকালে উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস পায়। কবির মানস-ক্ষেত্রে অনুভূতির যে বীজ উপ্ত হয় তা থেকেই সৃষ্টি হয় মহীরুহ। বীজ থেকে মহীরুহের সম্ভাবনার মধ্যেই মিশে থাকে কবির সারা জীবনের অবিচ্ছিন্ন বেদনা ও যন্ত্রণা। কবি আশা করেন, লোকজীবন রক্তাক্ত নয়, গোলাপ হয়ে উঠুক। নানা অবস্থান পরিবর্তনের মধ্যেও পবিত্র মুখোপাধ্যায় এই বিশেষ চেতনা প্রবাহ লালন করেন।

১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল, এই দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের নিবিড় কাব্যসৃষ্টির বিপুল ফসল। বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি তিনি। তাঁর কবি-মানস সঞ্জাত কবিতার শক্তি এবং সৌন্দর্য বিস্ময়কর। গত শতকের সত্তরের দশকে প্রথম আবির্ভাবেই সাড়া জাগানো এই কবি নিরন্তর সৃজনশীল, নিরীক্ষামগ্ন এবং তাঁর কাব্যের গুণমান সুউচ্চ, অম্লান। বীতশোকের মনন এবং দর্শন, অভীপ্সা

এবং অভিসার জোরালোভাবে উপস্থাপিত হয়েছে - 'অন্যযুগের সখা', 'শিল্প', 'দ্বিরাগমন', 'নতুন কবিতা', 'প্রদোষের নীল ছায়া', 'এসেছি জলের কাছে', 'নীল এক পাতা', 'বসন্তের এই গান' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যগুলো প্রমাণ করে বীতশোকের কবি-মানস প্রেমিকের এবং তাঁর অভীপ্সা মন্ত্রসৃষ্টির। সবচেয়েবড় কথা, বীতশোকের অভিসার লোকায়তের চিরজ্যোৎস্নায়। লোক কবিতার গভীর দেশজ কাব্যধারাটির দ্বারাই সঞ্জীবিত বীতশোকের কাব্যশৈলী। নিরতিশয় আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সেই উৎস প্রবাহটি থেকে বিচ্যুত হননি কখনও। একথা অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের খুব কম বাঙালি কবির সম্পর্কে বলা যায়।

আধুনিকতার প্রশ্নেও বীতশোকের কবি মানস ব্যতিক্রমধর্মী। কবিতার ক্ষেত্রে পশ্চিমী আধুনিকতাবাদের যে প্রচলিত মডেলটি রয়েছে , বীতশোকের কবিতা সেই মডেলের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় আদপেই। কারণ সেই মডেলের যে তিনটি প্রধান শর্ত - নাস্তিকতা, নির্বেদ এবং ব্যক্তিবিষাদ, তার কোনোটিই বীতশোকের কবি-মানসে আভাসিত নয়। বরং ঐতিহ্যবাহী লোক-মানসে তিনি অনেক বেশি সুস্থিত। বীতশোক অবশ্যই আধুনিক, বাহ্যত আধুনিক, কারণ কবিতায় তাঁর চিন্তন-পদ্ধতি আধুনিক, তাঁর লিখন-পদ্ধতি আধুনিক, প্রবণতা অনুযায়ী দেশজ ঐতিহ্যের মিশ্রণে বাংলা কবিতায় আধুনিকতা যে বিশেষ ধারা তৈরি হয়েছে, বীতশোক সেই ধারার কবি। এই ধারাটি অবয়বে আধুনিক কিন্তু অন্তরে অস্তিবাদী। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বীতশোকের মানস-যাত্রার শুরু এইভাবে-

> ''পাতার ওপর রোদ পড়েছে পাতার ওপর ছায়া
> মাটির ওপর নকশা আছে মেলা ঃ
> গাঁ পেরিয়ে মেলায় এসে মেয়েরা যেন আহা
> গলা জড়িয়ে কাঁদছে বিকেল বেলা।
> কাঁপছে ছায়া, থামবে কেঁপে যেন বিকেলের আলো,
> অন্ধকারে নদীতে আর নদীতে হবে দেখা,
> অন্ধকারে বোনকে ছেড়ে বোন রে কাঁদিস না লো।
> একলা চলে শালের বনে ঝিঁঝিঁর ডাকে একা।''[৯]

কবি-মানস কবিতা মধ্য দিয়েই লোক-মানসের সঙ্গে গোপনে কথা বলে। প্রকৃতি, ধর্ম, সভ্যতা ইত্যাদি নিয়ে গুরু গম্ভীর কথা নয়, লোক-শরীরের রক্ত ও গায়ের চামড়া ছুঁয়ে দুর্বিষহ কথাবলি। কবিতা যদি শপথ হয় মন্ত্র হয়, বিষাদ-যন্ত্রণা এমনকি ঈর্ষা বা কলহও হয়, সেওতো লোকমন নিয়ে। কবিতার ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে তবে তা লোক-মানসকে প্রাণিত করা। এর জন্যেই শব্দ, ছন্দ, পরিকাঠামো, স্বরভঙ্গি। বলা বাহুল্য, কবিতা কেবল বক্তব্য প্রকাশক নিবন্ধ যন্ত্র নয়, নিছক ছন্দ মিলনের অহেতুক কারুকর্মও নয়, অথবা গদ্যার্থ মাত্র নয়। কবিতা যেহেতু শিল্পকলা, তাই তার অন্তরালে অনবরত কাজ করে যায় অলক্ষ্য, অলঙ্ঘ্য ও রহস্যময় কবিমানস। এই কবি-মানসের নিকটতম বন্ধু হল উপমা। কবি অবশ্যই চিত্রকল্প, রূপকল্প ব্যবহার করবেন, কিন্তু উপমা ব্যবহারের দ্বারা কবিরা লোক-মানসকে প্রভাবিত করে আসছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। অনুপ্রাস বা যমক নয়, দৈনন্দিন কথা বার্তায় যে উপমা লোক-মানসের সৃষ্টি, সেই স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক অলংকারই কবিতাকে মনোজ্ঞ করে। উপযুক্ত অলংকার যে কবিতায় থাকে সেই কবিতাই পারে কবি মানসকে লোক-মানসের গভীরতায় নিয়ে যেতে।

মনীন্দ্র গুপ্তের কবি-মানস সমৃদ্ধ হয়েছে এই জীবনের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থায়। কিন্তু সেই বিশ্বাসের স্বরধ্বনি উচ্চকিত নয়। নম্র নিবেদনের মধ্যেই সেই প্রত্যয়ের প্রাণশক্তি। কারণ তার রেশ বাতাসে, আলোয়, প্রকৃতির রম্যতায় ছড়িয়ে যায়। তাঁর কাব্য ভাবনায় ও কল্পনায় সেই কবি-মানসের সন্ধান পাওয়া যায় যেখানে উদার আকাশের মতো নিঃশব্দ এক প্রতিমার আদল জ্বলজ্বল করে। দীর্ঘ আয়ুর ছায়ায় বসে তিনি একটি একটি করে কবিতা রচনা করেছেন, গভীর প্রত্যয়ে তাঁকে বলতে শুনি, "কবিতার জন্য জাগরণ যেমন দরকার তেমনি দরকার পতন ও বিষাদ। একদিন যেমন চেয়েছিলাম দীর্ঘ যৌবন এখন তেমনি চাই শান্ত প্রাচীনতা। এই তো সময় যখন পৃথিবীর খেলুড়ি হয়ে আবার বাল্যে ফিরে যেতে পারি।"[১০] স্বীয় কবি মানস প্রসঙ্গে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, "লেখাপড়া শুরু হবার আগেই কবিতার দূতী-সখীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ছেলেবেলার সেই অবোধ সময়ে ওঁরা আসতেন আমার ছোট্ট জীবনের তুচ্ছ ঘটনা ধরে আর অফুরন্ত নিসর্গের ছদ্মবেশে। তখন থেকেই আমার

কাছে কবিতার কলা-কৌশল চাতুরী ছিল গৌণ। উপকরণ যতটুকু পেয়েছিলাম তা শুধু জীবনের কাছ থেকেই।"[১১] কথাটা যে কত সত্যি তার প্রমাণ রয়েছে অনেক কবিতার মতো 'ব্রহ্মসূত্র'কবিতাতেও -

"শুয়ে শুয়ে ছেলে বেলার কথা মনে পড়ে-
তখন ঘুমপাড়ানি মাসিপিসিরা
ঘুমের মধ্যে এসে পান সুপুরি খেয়ে,
গল্পগাছা করে কত আনন্দ করে গেছে।"[১২]

কবিতার কাছে মনীন্দ্র গুপ্ত 'সরল' থাকার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন সোজা পথে তার মর্মের কাছে যেতে। কবি মনে করেন, তাঁর রচিত কবিতাগুলো "এই জন্মের হৃদয়, মন ও কল্পনার নির্যাস।" কবিতা তাঁকে "অবিন্যস্ত করেছে, তছনছ করেছে, আত্মসাৎ করেছে, কেড়ে নিয়েছে বহু কিছু। কিন্তু দিয়েছেও তো অনেক।"[১৩]

মনীন্দ্র গুপ্তের কবিমানস লোক জীবন ভাবনায় ঋদ্ধ। তিনি জীবনের কথা লিখেছেন, মৃত্যুর কথাও অলিখিত থাকেনি তাঁর কবিতায়। "সূর্যাস্তের ছায়া এবং আগুনে মেঘের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বুঝি, সূর্য ডুবে যাবার পর চাঁদ উঠবে, তারায় আর অন্ধকারে আকাশ ছেয়ে যাবে, কতদূরে ছায়াপথ দেখা যাবে। জীবন শেষ হলেও অস্তিত্ব শেষ হবার নয়। আয়ু মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে চিরায়ু হবার পথে চলে।"[১৪] এই বিশ্বাস নিয়েই কবি লিখেছেন শাপলা, কলমি, নটেশাকের সঙ্গে গ্রামীন স্কুল ও মেয়ে-পড়ুয়াদের কথা -

"তুমি চাঁদ তারা সূর্য নিয়ে চিন্তা করছ
আমি ভাবি শাপলা কলমি নটেশাকের কথা।
হরিমতি স্কুলের মেয়েরা স্কুল ছুটির পরে
পথ দিয়ে চলেছে -বাড়ি ফিরবে, কোচিং-এ যাবে
জিভ আর টাকরায় শব্দ করে আলুকাবলি খাবে।
পথে ভাদ্রের পড়ন্ত বেলায় ওদের মুখের উপর
আমগাছের ছায়া পুটুশগাছের ছায়া পড়েছে-

শাপলা কলমির কথা যেমন ভাবি
ওদের কথাও তেমনি ভাবি ।''

('গ্রামীণ' /সুবল সামন্ত সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা ঃ
সৃষ্টি ও স্রষ্টা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত / পৃষ্ঠা ২৪)

লোক-মানস কবি মনীন্দ্র গুপ্তের কবি মানসকে এইভাবেই বার বার সৃজনশীলতায় উস্‌কে দেয় । আমরা লোক-জীবনের উত্তাপের স্পর্শ পাই তাঁর কবিতায় । লোক-জীবন ও মানুষের অস্তিত্ব কবিকে সৃজনের উপকরণ ও অভীপ্সা জাগিয়েছে বার বার ।

শিবনারায়ণ রায়ের কবি-মানসে কবিতা ভাবনা ছিল এই রকম, ''এই ভঙ্গুর, নিরর্থ, উদাসীন, অনির্ভরযোগ্য, অনবস্থ জগতে যে অল্প কয়েকটি সূত্র থেকে অমরত্বের অপরোক্ষ আস্বাদ পেয়েছি কবিতা তাদের মধ্যে প্রধান । কবিতা আমাকে শুধু সুখ দেয়না, অন্য এক জগতের ছাড়পত্র দেয়, যে জগতে যা কিছু প্রাত্যহিক তা বিস্ময় ও রহস্যের দ্বারা অন্বিত, তা ক্ষণিক তা হীরার প্রোজ্জ্বল অভেদ্যতায় উদ্ভাসিত, যা আমার জীবনে আদৌ ঘটেনি অথবা ঘটে থাকলেও টের পাইনি তা যে- জগতে গভীর, প্রবল, বহুভেদ অর্থবহতায় অস্তিত্ববান । তাই কবিতার কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য এবং কবিদের প্রতি আমার আকর্ষণ দুর্মর । রোদে, ঘামে ভীড়ে সারাদিন বিপর্যস্ত, পথে, পাড়ায়, স্টেশনে, বস্তিতে, রেলপথের ধারে নিরাশ্রয়, আশাভরসাহীন, বুভক্ষু স্ত্রী-পুরুষের দুঃখমোচনে নিজের অপরাগতায় নিজেন প্রতি বীতশ্রদ্ধ, পরিচিত অপরিচিত অল্পপরিচিতদের মধ্যে ধাপ্পা আর ঘুষের ব্যাপকতা দেখে উদ্‌ভ্রান্ত, জরা, ব্যাধি ও নিঃসঙ্গতার অনিবার্য আক্রমণে ভয়ার্ত - আমি তখন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে কখনো কখনো মরণেচ্ছার সঙ্গে বিনিদ্র লড়াই করি তখন আমাকে আজও যা শক্তি যোগায় তা মদ বা মার্কস্‌ বা কোনো দার্শনিক বিশ্বাস নয়, তা কবিতা ।''[১৫]

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবি শিবনারয়ণ রায় জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যখন লেখেন -

''হে প্রকৃতি আমার প্রার্থনা
শুক্লকেশ নাস্তিকের অন্তিম প্রার্থনা

মাটি জল হাওয়া আলো আমাকে যখন
ফিরিয়ে নেবে
তুমি রেখো আমার অস্মিতা
একটি বলিষ্ঠ বীজে ।''

('প্রার্থনা' /সুবল সামন্ত সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা ঃ
সৃষ্টি ও স্রষ্টা' / পৃষ্ঠা ১৪)

তখন প্রশ্ন জাগে, শিবনারায়ণের কবি-মানস কেন 'একটি বলিষ্ঠ বীজের' প্রত্যাশী মনে হয় কবি মহীরূহ হয়ে লোক-মানসে সুনিবিড় ছায়া বিস্তারের অভিলাষী । নামহীন যত পাখি এ জীবনে চির অনাত্মীয় হয়ে রইল, যে বৃক্ষ-লতা-গুল্মের সঙ্গে কবির পরিচয় এ জীবনে ঘটল না, যে উত্তুরে বাতাস তাঁকে শীতল করল না, যে সড়কে তিনি কখনো হাঁটলেন না, যে আবাসে তিনি কখনো গেলেন না, আঁজলা ভরে যে নদীর জলে শুক্‌নো ঠোঁট দুটি ভেজালেন না, পালতোলা নৌকোয় চড়া যার কপালে কোনোদিন ঘটল না, সেই অপ্রাপ্তির দুর্মর দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে কবি আবার ফিরে আসতে চান লোক-জীবনে । তাই কবির বীজ থেকে মহীরূহে পরিণতির প্রত্যাশা ।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের আর একজন কবি কৃষ্ণ ধর । চারের দশকের শেষের দিকে তরুণ বয়সে 'অঙ্গীকার' নামে একটি চটি কবিতার বই দিয়ে লেখালেখির জগতে তাঁর প্রবেশ । তারপর থেকে বিগত কয়েক দশক ধরে তিনি লিখে চলেছেন । কবিতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, 'কবিতা মানুষকে তিমির রাত্রি পার হয়ে ভোরের দিকে চালিত করে ।' এই উক্তির প্রেক্ষিতেই কৃষ্ণ ধরের কবি-মানসের প্রকৃতি উদ্ভাসিত হয় । ''একটুকু বুঝি এবং বিশ্বাস করি, কবিতা মানুষের জন্য । ব্যক্তির প্রতিভা তাকে জন্ম দিলেও সে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার কর্দমে আচ্ছাদিত হয়ে থাকার ভবিতব্য নিয়ে আসে না, তার শিল্প সৌন্দর্য, দীপ্তি ও মননশীলতা সবই মানুষকে তিমির রাত্রি পার করে ভোরের দিকে চালিত করার জন্য । আমি মানুষের সৃষ্টি, স্বপ্ন ও সংগ্রামের আলেখ্যই কবিতায় রূপ দিতে চাই । আমার পূর্বসূরীদের সামূহিক শিল্প চেতনার প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল হয়েও

একথা নিবেদন করি যে কবিতা শিল্প কখনোই জীবনের চেয়ে বড় নয়। সেই জীবনের আবহমান স্রোতেই আমার শিল্পীসত্তার অবগাহন ও তার শুদ্ধতা অর্জন।''[১৬]

কবি কৃষ্ণ ধরের কবি-মানস সঞ্জাত এই উক্তির সত্যতা রয়েছে তাঁর কবিতায় -

''.... পথ চলতে চলতে সাথী জুটেছে বিস্তর
তাদের সঙ্গে পা চালিয়ে আসার সময় কথা বলার
সুবাদে আমার ঝুলি এখন ভর্তি লোককথায়
তার ভিতরে কত রোমাঞ্চ, কত দীর্ঘশ্বাস, সাপব্যাঙ
ছাতা মাথা জড়িবুটির খবর
পথ হাঁটার এটা উপরি পাওনা।''

('হাটব, থামব না'/ সুবল সামন্ত সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত/ পৃষ্ঠা ৩১)

অরুণ মিত্রের কবি মানস প্রসঙ্গে মনে পড়ে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, ''কবিতা রাজনীতি নয়, রাজনীতিতে যে বামপন্থী ছাপ দেওয়া হয়, কাব্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য বলে আমি মনে করি না। রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের জন্য তো কবিতা লেখা হয়না, কবিতা লেখা হয় জীবনের অভিঘাতে কবি-হৃদয়ে যে স্পন্দন সৃষ্টি হয় তাই প্রকাশ করার জন্য। .... যান্ত্রিকতা কবিতার সবচেয়ে নৃশংস ঘাতক।''[১৭]

কবি অরুণ মিত্র লোক-মানসের পরিচয় পান প্রতি মুহূর্তের জীবন যাপনে সংগ্রামী মানুষের হাতছানির দুর্মর আকর্ষণে। তাঁর কবিতায় রিক্‌শাওলা, বস্তিবাসী মানুষ, গৃহ পরিচারিকা, শ্রমিক রমণী, দোকানের কাঁচে মুখ ঠেকানো নিঃস্ব শিশুর দল, পথের মধ্যে খেলা দেখানো মাদারি, পথচারী সাধারণ মানুষ বারংবার আসে। এ সব কিছুই লোক-মানস অনুসন্ধানের ফসল। তাঁর কবিতায় আগাগোড়া রয়েছে মানুষের প্রতি এক গভীর ভালবাসাবোধের পরিচয়। মানুষ এবং প্রকৃতি দুইই তাঁর ভালোবাসার রসে সিঞ্চিত। তাঁর কাব্যে মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ একটি গুণের মতো উপস্থিত। গ্রাম বাংলাকে তিনি দেখেছেন। তিনি সব থেকে বস্তুবাদী কবি এই অর্থে যে বস্তুর অশেষ সম্ভাবনাকে তিনি বুঝে

নিতে চান । লোক-মানসকেও তিনি কাব্যে উপস্থাপিত করেন সাম্যবোধের প্রেরণায় । পারিপার্শিক-মানস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিস্তৃত বলেই তিনি লিখতে পারেন -

"আমি পাকা ধানের হাসি দেখেছিলাম
বুড়ো বুড়ির চোখে
ছেলে মেয়ের মেলায় দেখেছিলাম
আলো ।"

('কলকাতায়' / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

অরুণ মিত্রের কবিমানসে যে লোক-মানসের প্রভাব তা প্রেম বিবর্জিত নয় কখনোই । 'তাঁর কবিতায় প্রেম সর্বজয়ী, সর্ব বিস্তারী । সে প্রেম নারীতে, শিশুতে, মায়ের আঁচলে যেমন ন্যস্ত, তেমনি পল্লী গ্রামের দরিদ্র মানুষের কুটির প্রান্তেও বিছানো তার মধুর আসন ।"[১৮] লোকায়ত নারী-মানসের প্রেম কবির জীবনে এনেছে এক গভীর অনুভূতি । বলা বাহুল্য, এই নারী-মানস যেহেতু লোক-জীবন বিবর্জিত নয়, সমাজ-সংস্কার থেকে দূরে নয়, তাই নারীর কাছে তাঁর প্রত্যাশা-

"সেই উৎসে তুমি আমাকে উজিয়ে নিয়ে চলো
স্থান কাল পার হয়ে যত ঘনিষ্ঠ ঘর
তাদের ছায়া রোদ রং বদল নানা আকাঙ্খার মতো
আমি তা তোমার চোখে দেখব ।"

লোক-মানস নির্ভর যে লোক-জীবন তার প্রতি ভালোবাসা গভীর ছিল বলেই অরুণ মিত্রের কবিতায় প্রেম চেতনা এত তীব্র, এত ব্যাপক ।

কবি শামসুর রহমান বলেন যে পথ চলাতেই তাঁর আনন্দ, গন্তব্যে পৌঁছানো বড় কথা নয় । "কবিতা লেখার সময়, কোনো এক রহস্যময় কারণে আমি শুনতে পাই চাবুকের তুখোড় শব্দ, কোনো নারীর আর্তনাদ, একটি মোরগের দৃপ্ত ভঙ্গিমা, কিছু পেয়ারা গাছ, বাগান ঘেরা একতলা বাড়ি, একটি মুখচ্ছবি, তুঁতগাছের ডালের কম্পন, ধিকিয়ে চলা ঘোড়ার গাড়ি, ঘুমন্ত সহিস ভেসে ওঠে দৃষ্টিপথে বারবার । কিছুতেই

এগুলি দূরে সরিয়ে দিতে পারিনা । যা-কিছু মানুষের প্রিয়-অপ্রিয়, যা কিছু জড়িত মানব নিয়তির সঙ্গে, সে সব কিছুই আকর্ষণ করে আমাকে । সবচেয়ে বড় কথা, সুদূর সৌরলোকে, এই চরাচর, মানুষের মুখ, বাঁচার আনন্দ কিংবা যন্ত্রণা, সবসময় বন্দনীয় মনে হয় আমার কাছে । যে মানুষ টানেলের বাসিন্দা, যে মানুষ দুঃখিত, একাকী সে যেমন আমার সহচর, তেমনি আমি হাঁটি সে সব মানুষের ভিড়ে, যারা ভবিষ্যতের দিকে মুখ রেখে তৈরি করে মিছিল ।''[১৯]

শামসুর রহমানের কবি-মানসে ভেসে বেড়াত লোক জীবনযাত্রার নানা ছবি । জেলে জাল হাতে নিয়ে ছিপছিপে নৌকোয় বসে যাত্রা করছে শিকারের অভিযানে, একজন কিশোরী উঠোনে দাঁড়িয়ে পেয়ারা চিবোচ্ছে, ক-জন বালক-বালিকা মহানন্দে খেলায় মেতে উঠেছে, একজন যুবতী কাঠের চিরুণী দিয়ে লম্বা চুল আঁচড়াচ্ছে, একজন স্বাস্থ্যবতী মা তার শিশু সন্তানকে ঘুমপাড়ানি ছড়া শোনাচ্ছে, একজন বুড়ো হুঁকো টানছে পরম তৃপ্তিতে - এইসব ছবিই লোক-মানসের সন্ধান দিয়েছিল কবিকে । অজস্র প্রতিকুলতার পথ মাড়িয়ে লোক-মানস সন্ধানী কবি জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর কবিতায় ।

কবি আল মাহমুদকে 'লোক-লোকান্তর' কবিতায় বলতে শুনি -

''আমার চেতনা যেন একটি সাদা সত্যিকারের পাখি
বসে আছে সবুজ অরণ্যে এক চন্দনের ডালে
মাথার ওপরে নীচে বনচারী বাতাসের ডালে
দোলে বন্য পানলতা, সুগন্ধ পরাগে মাখামাখি
হয়ে আছে ঠোঁট তার''

এই 'চেতনা'-ই তো কবি-মানসে পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো অচ্ছেদ্য সম্পর্কে অন্বিত । এই চেতনাই কবিকে কবিতার বিষয়-বস্তু নির্বাচনে সহায়তা করেছে । কবি নির্বাচন করেছেন প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশভূমির বস্তু নিচয় । কবির ভাষায়, ''প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশভূমিই আমার কবিতার বিষয়বস্তু । জগতে আর কি আছে ? খুঁজতে খুঁজতে আমি

সারা নিসর্গ মন্ডলকেই এলোমেলো করে ফেলেছি । এখন আর একের সাথে অন্যকে মেলাতে পারিনা । জাগতিক সব সৌন্দর্যবোধ শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিকর । যেমন হাস্যকর নদীর সাথে নারীর তুলনা । কবির প্রিয়তমা নারীর সাথে নিসর্গের কোনো তুলনা হোক বা না হোক কবির একটি প্রধান কাজ হল এই উপমা উত্থাপন করে যাওয়া । প্রাণের সাথে প্রকৃতির এবং দৃশ্যমান জগতের বস্তুনিচয়ের পরস্পরে তুলনা-প্রতিতুলনার সফলতা ও ব্যর্থতাই সম্ভবত কবির জীবনকে অধিকার করে থাকে । শব্দ, ছন্দ ও মিলনের পারদর্শিতা হলো আঙ্গিক-গঠনের বাইরের ব্যাপার । ভেতরে আসলে কেবল উপমারই জালে বোনা ।''[২০]

আল মাহমুদের কবি-মানসের আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কবির অসহায়তা ও জীবিকার অনিশ্চয়তা অন্যান্য অনেক কবির মতো তাঁকেও স্থিরভাবে দাঁড়াতে দেয়নি । আর কবি তো জন্মেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশে । কবির কৈশোর ও যৌবনকাল কেটেছে দারিদ্র মোচনের চিন্তায় । কবির দৃঢ় বিশ্বাস, এর প্রতিকার মানুষের হাতেই । এই চিন্তাই কবিকে পৌঁছে দেয় রূঢ় বাস্তবের কাছাকাছি । পৃথিবীর মায়াবী দৃশ্যপট ছেড়ে একসময় সাধারণ মানুষের জীবনের চালচিত্রে অন্তর্সম্পর্ক স্থাপন করেন -

''কবিতা তো ফিরে যাওয়া পার হয়ে হাঁটুজল নদী
কুয়াশায়-ঢাকা-পথ, ভোরের আজান কিংবা নাড়ার দহন
পিঠার পেটের ভাগে ফুলে ওঠা তিলের সৌরভ ।

কবি গণেশ বসুর কবিতা-ভাবনায় পাই তাঁর কবি-মানসের পরিচয় । তিনি বলেন,''কবিতাই প্রেম ও প্রণাম । কবিতাই জীবনের নাম । আনন্দ বিষাদে পারাপার এবং সংগ্রাম । শিল্প যৌবনের কথা বলে, স্বাধীনতার কথা বলে, কবিতা মুক্ত মানবতা । কবিতা, সত্যিকারের আধুনিক কবিতা গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির মূল মন্ত্র ধারণ করে । জনগণের স্বাধিকার রুটি-রুজির সংগ্রামে সে একাত্ম ।'' ('কবিতা ভাবনা' - গণেশ বসু / বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্ঠি ও স্রষ্টা - সুবল সামন্ত সম্পাদিত / পৃষ্টা ৭৮/ ২য় খন্ড) এই ধরণের কবি-মানসের পক্ষেই সম্ভব সেই কবিতা রচনা করা, যার মধ্যে

থাকে সাধারণ মানুষের মুখের কথা, তাদের আবেগ মথিত কণ্ঠস্বর, জীবনরসবোধের গভীরতা, ক্ষুব্ধচিত্তের সুতীব্র কষাঘাত –

"ক্ষুধা মানে বেঁচে থাকা ফুটপাতে রাত্রি জাগরণ ।
ক্ষুধা মানে বেঁচে থাকা বেহুলার ভাসানো মান্দাস ।।
ক্ষুধা মানে ধূমাবতী সূর্যমুখ শিকড় সন্ধান ।
ক্ষুধা মানে বেঁচে থাকা ছিন্ন ভিন্ন জীবন ধারণ ।।
ক্ষুধা মানে কান্নাকাটি, লোকভাষা, শ্মশানের চিতা ।
ক্ষুধা মানে বিষকুম্ভ, পরমান্ন শ্রীমতি সুজাতা ।।"

লোক-মানস থেকে কবি-মানসে শুধু ভাষাই বিস্তারিত হয়না, কঠিন বাস্তবের ছবিও ভেসে ওঠে । দেশের মানুষের মনে যে অন্নাভাব, কষ্ট, দারিদ্র্যের বেদনা তা-ই কবিকে অনুপ্রাণিত করে উপরের পংক্তিগুলো লিখতে । কবি-মানস সঞ্জাত সমাজ তাই 'লণ্ডভণ্ড', বিশ্বায়ন তাই 'শোষণ' মাত্র, জীবন তাই 'ছিন্নভিন্ন' । এই অবস্থায় কবি-মানস থেকে কোন আশার বাণী লোক-মানসে প্রভাবফেলে না । বাস্তব সমাজে যে রেষারেষি, স্বেচ্ছাচার, পরশ্রীকাতরতা, ভ্রষ্টাচার, ধ্বংসের উন্মাদনা, ছিন্নভিন্ন জীবন ধারণ, ফুটপাতে রাত্রি জাগরণ - তা লোক-মনে বেঁচে থাকার আশা হারায় না, ভালবাসার ছন্দপতন ঘটায় না —

".....ভালবাসা হবে না ছায়াপথ
হাওয়ায় ওড়ানো অঙ্গীকার
ভালোবাসা ছন্দে জেগে ওঠা
নাগাড়ে নিজেকে আবিষ্কার ।"

('তোমাকে'-গণেশ বসু / সুবল সামন্ত সম্পাদিত বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা থেকে সংগৃহীত / পৃষ্ঠা ৭৯)

জয় গোস্বামীর কবি-মানসের পরিচয় পাই তাঁর একটি উক্তিতে, "আমার সামনে থাকে একটি পাতা এবং তার ওপরে লেখা কবিতাটি, পাতাটি সরিয়ে নিলেই কবিতাটি জীবনের মধ্যে ডুবে যাবে । আমার কাছে কবিতা এইটুকুই । আগে বলতাম ভালবাসার জন্য কবিতা লিখি, আজ তার সঙ্গে যোগ করি, জীবিকার জন্যও লিখি । তবে শুধু জীবিকার জন্য নয়,

সুন্দর যেখানে এসে জীবিকার সীমায় মিশেছে, সেই সীমায় দাঁড়িয়ে আমি কবিতা লিখি।

কবিতা কী আমি জানিনা। একটা কথা আমার মনে হয়, ধরুন একটি মেয়ে আপনার দিকে তাকাল - আপনি তার দিকে তাকালেন। আপনাদের মধ্যে কোন আলাপ নেই। কিন্তু একটা সম্পর্কতো হলো - দৃষ্টির সম্পর্ক। মানে আমি কোনো প্রেমের কথা বলতে চাইছি না - এসবের বাইরে। তো আপনি বলতে পারবেন মেয়েটি আপনাকে ঠিক কি বলতে চেয়েছিল ? আপনি বললেও মেয়েটি কি ঠিক তাই বলতে চেয়েছিল ? তো এইরকম দৃষ্টির একটা প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় মনের মধ্যে। আমি যেমন নিশ্চিতভাবে জানিনা যে এই প্রতিক্রিয়া ঠিক কী, তেমনি আমি কবিতা কী তাও জানি না। আসলে আমি যা বলতে চাই তার খুব সামান্য অংশ আমি বলতে পারি কবিতায়। এই বলতে চাওয়া এবং বলতে পারার ব্যবধান আমাকে এত অস্থির করে যে কবিতাটি ঠিক হচ্ছে কি না তা আর ভাবতে পারিনা, বরং পরের কবিতাটি লেখার জন্য দৌড়োই।" (বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা (২য় খন্ড)-সুবল সামন্ত সম্পাদিত / পৃষ্ঠা ৮৫)। বেশ বোঝা যায়, বস্তুর রূপকে কবি তাঁর মানসিক অবস্থা অনুসারে উপলব্ধি করেন। একই কবি এক মানসিক অবস্থায় কোনো বস্তুর যে রূপ উপলব্ধি করেন, পরিবর্তিত মানসিক অবস্থায় সেই কবিই বস্তুর অন্যরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। জয় গোস্বামীর কবি-মানস প্রসঙ্গে এই কথাটি বড় বেশি সত্য বলে মনে হয়। তাঁর কাছে লোক-কায়া বড় নয়, কায়ার অভ্যন্তরে যে লোক-মানস তার অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কবি-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-অশ্রুর কথা বলেন, তাঁর শিল্পকর্মে সেই লোক-মানসকে রূপায়িত করেন। কবি-মানসের ভাব প্রেক্ষণে লোক-মানস এইভাবে শিল্পিত হয়ে ওঠে জয় গোস্বামীর কবিতায় -

"এবার লক্ষীশ্রী মুছে গেছে
কেউ ফিরে তাকাবে কি আর ?
দুই নয়, তিনের কোঠায়
এইবার ঝরে যাবে তার
দিন, বুঝি দিন চলে গেল
চোখ থেকে মুগ্ধতা পাবার

কদিন, কয়েকদিন পরে

কেউ ফিরে তাকাবে কি আর ?''[২১]

এতো শুধু বিশেষ স্থান-কাল সীমাবদ্ধ একটি নারীর কথা নয়, সমগ্র নারী-মানসের কথা। পরিবেশ পরিস্থিতি নিরপেক্ষ এই নারী-মানসের কথা জয় গোস্বামীর কবিতায় প্রকাশ পায় এই ভাবে-

''আজ তাই ছোটো হোক চুল

খাটো হোক অঙ্গের বসন

আরও যত্নে মাজা হোক ত্বক

আরো তীব্র বাঁকা হোক ভুরু

এবার পথে বেরুলেই ঃ

'কী জিনিস বেরিয়েছে গুরু।'

এইতো লক্ষীশ্রী মুছে গেছে

আজ থেকে জেল্লা মার-মার

আজ থেকে স্বাধীনতা জারি

কাল ছিল বধুমাতা, আজ...

নারী মাংস, নারী মাংস, নারী...

পথে পথে সহস্র পুরুষ

মনে মনে নোংরা করবে তোকে

তাই নিয়ে অবুঝের মতো

গর্ব হবে তোর হতভাগী !

আমি কবি দুর্বল মানুষ

কীভাবে বাঁচাবো তোকে ভাবি....''

(সুবল সামন্ত সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা' / ২য় খন্ড গ্রন্থে প্রকাশিত জয় গোস্বামীর 'একটি দুর্বোধ্য কবিতা')।

এখানে নারী-মানসের এক বিশেষ অবস্থার কথা শিল্পিত হয়েছে। জয় গোস্বামী তাঁর উদ্দিষ্ট বিষয়কে এখানে যথাযথরূপে উপস্থাপিত করতে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় ঘটনা বর্জন করে প্রয়োজনীয় ঘটনাকে পূর্ণাঙ্গ স্বরূপে উপলব্ধি করে প্রকাশ করেছেন। এইভাবে কবি-মানস লোক-মানসের সান্নিধ্য কামনা করে এবং শেষে কবির সৃজনী-কল্পনায় জীবনের অনুকরণ যোগ্য উপাদানে নির্মিত হয় কবিতার দেউল। জয় গোস্বামীর কবি বহির্জীবনকে আশ্রয় করেছে, লোক-মানসকে প্রশয় দিয়েছে বটে, কিন্তু অন্তর-জীবনের অনুভূতি-উপলব্ধিকে যথাযথরূপে বাণীবদ্ধ করতে পেরেছেন বলেই তিনি লোক-মানস পর্যবেক্ষক কবি।

'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮৭-তে কবি আলোক সরকার তাঁর কবি-মানস প্রসঙ্গে লিখেছেন ''প্রকৃতির ছন্দ আমার নয় বরং প্রকৃতির ছন্দের পাশাপাশি দ্বিতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে পাবার জন্যই ছন্দ।... আমার জীবনে যা কিছু আছে তা কতকগুলি রঙ-বহুবর্ণ বিচিত্র অভিনব দাম্ভিক নির্জন স্বয়ংসম্পূর্ণ রঙ। বয়স যতো বাড়ছে রঙ ততো বেশি হচ্ছে, বর্ণালি আরো বেশি ঊর্মিল, একটা বর্ণ খুব ছড়িয়ে পড়ছে আর একটা বর্ণে। এটা এক ধরণের খেলা, আবহমানের খেলা, প্রবহমান নিস্তরঙ্গ বিদ্যুৎনিবেশী খেলা।... আমার কবিতা আমার সঞ্চিত রঙগুলির কবিতা। তাদের হয়ে ওঠা, তাদের ভেঙে ছড়িয়ে পড়ার কবিতা। কেবলই কি রঙ ? ঠিক তা নয়। অনেকগুলি রঙ, তার পাশে ঘটনারই ভিতর থেকে জেগে ওঠা অনেকগুলি ধ্বনি, আর তার পাশে সপ্রতিষ্ঠ স্পর্শময় ইঙ্গিত-সঘন অনেকগুলি ঘ্রাণ।'' - এহেন কবি-মানসে তো সমসময়ের লোক-মানসের সংঘাত-সংকট ফুটে ওঠা সম্ভব নয়। জীবনের প্রথম পাঁচ দশক কবি আলোক-সরকার যেভাবে নিজের পরিপার্শ্বে বা সময়ের দিকে সম্পূর্ণ মুখ ঘুরিয়ে অবিরলভাবে নিসর্গ প্রকৃতির নানা প্রসঙ্গ- সাজানো বাগান, বিচিত্র রঙের ও গন্ধের নানা রকমের ফুল, গাছ, যার মধ্যে আছে গন্ধরাজ, জুঁই, কামিনী, বেলফুল, বকুল, শিউলি, রজনীগন্ধা, হাসুহানা, কাঠচাঁপা, গুলমোহর, গোলাপ, কৃষ্ণচূড়া, শিরীষ, পলাশ, জবা, শিমূল, ছাতিম, স্থলপদ্ম, বট, অশ্বত্থ, পারুল, নিম. পিপুল, দেবদারু, ঝাউ প্রভৃতির মধ্যে যে বিশুদ্ধ চৈতন্যের অনুসন্ধান করেছেন তাতে লোক-মানসের কথা একান্তভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু

১৯৫০ সালে প্রকাশিত 'উতল নির্জন' কাব্যগ্রন্থ রচনার সময় ও তার পরবর্তী কয়েক দশকের কথা ছেড়ে দিলে দেখব আলোক সরকারের কবিতা ক্রমশ লোক-মানস ঘনিষ্ঠ হয়েছে। নানা ধরণের প্রাণী-পিঁপড়ে-প্রজাপতি-পাখির সাথে 'মানুষ' ক্রমশ স্থান করে নিয়েছে তাঁর কবিতায় -

"একজন সুখী মানুষ ওই বড় রাস্তা দিয়ে চলেছে -
ওর বাঁপাশে রয়েছে ওর বউ, ওর ছেলে আর মেয়ে।
লাল বেলুন সাঁতার কাটছে হাওয়ায়
চুড়ি ঝুমঝুম করে বাজছে...
কথা বলছে অনর্গল কথাগুলো ঝলকে ছলকে নাচছে।"

('প্রাচীর' / রৌদ্রময় অনুপস্থিত)

কবি সমীর রায় তাঁর কবিতায় লোক-ঐতিহ্যের উজ্জ্বল সম্পদকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। তিনি যে প্রতীক-চিত্রকল্প-রূপক-উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেছেন সেগুলি লোকায়ত মানসিকতার ফসল। তাঁর কবিতার শব্দভাণ্ডারে রয়েছে অসংখ্য লৌকিক ও আঞ্চলিক শব্দ- যেগুলি সর্বজনবোধ্য। কবিতার পংক্তিতে তিনি এমন সব বাক্য ব্যবহার করেছেন যেগুলি লোক-ঐতিহ্য লালিত। তাঁর কবিতায় লোক-ছন্দ নতুন দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে। তিনি স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন যে আজকের নতুন ভাবনার দুনিয়ায় মানুষের মনে কবিতার নিজস্ব অভিঘাত সৃষ্টি করতে হলে এবং মহৎ কাব্য ভাবনায় উজ্জীবিত হতে হলে লোকায়ত ভাবনাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। 'পাখি তুই বল' কবিতায় কবি যখন বলেন, 'শিরায় ভিতর রোদভরা ধান' অথবা-

"হাত পোড়ালাম মাস পোড়ালাম পুড়িয়ে দিলাম মজ্জা
শুনবো বলে মায়ের মুখে তরজা"[২১]

তখন তাঁর লৌকিক ঐতিহ্য-লালিত মানসিকতার হদিস পাওয়া যায়।

সমীর রায়ের ভাবনা ছিল, "কবিতার মধ্যে লোক-ঐতিহ্যের উজ্জ্বল সম্পদকে রূপ দিতে হবে, প্রতীক-চিত্রকল্প-উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে লোকায়ত মানসিকতাকে গুরুত্ব দিতে

হবে, এমন শব্দভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে যা লৌকিক ও আঞ্চলিক হয়েও সর্বজনবোধ্য হবে, বাক্যে লোক-ঐতিহ্য লালিত শব্দ ও ছন্দকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যা নতুন দ্যোতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।"[২২]

দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের কবি-মানস প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে নিতে হয় তিনি তাঁর সমসময় অন্ত্যলগ্ন বিশ শতক থেকে আজও চিন্তাশীল অনুসন্ধানী। ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগ ভাবনা ও চিন্তন প্রণালী সার্বিক চেতনায় প্রতিভাসিত হয়েছে। লোকায়ত উত্তরাধিকারে দেশজ শব্দে, আটপৌরে শব্দে দেবীপ্রসাদের স্বাভাবিক স্ফূর্তি। মা, মাসি, বুড়ি ঠাকুমার মুখে মাটির গল্পমাখা আটপৌরে জীবনের কাহিনি, প্রবাদপ্রতিম পুরাণকথা সমস্তই তাঁর কবিতার অঙ্গে অঙ্গে মানানসই প্রয়োগ সংবিৎ। "আজ অপ্রচলনে যা বিলুপ্তপ্রায়, অথচ আমাদেরই মাতৃগর্ভের সংকেত, আধুনিক সংবেদের মিলনে তাঁর কবিতায় প্রতিষ্ঠিত হলো আর এক লোকায়ত চিত্তের প্রতিসরণ। প্রত্নপ্রতীতির এই সম্যক দিকচিহ্নে, জীবৎকাল ঐতিহ্যমূল থেকে উৎসারিত আবেগের অন্তঃস্রোতে কবি ভেসে রইলেন।"[২৩] এই লোকায়ত চিত্ত নিয়েই কবি লিখলেন লোক-জগৎ, লোক-মানসের কথা -

"পার হতে সাঁকো টলে যায়, দীর্ঘ নদীচরে
চরে কেবল যক্ষ্মার পাংশু চাউনি, জেলে পাড়া জুড়ে
শুকোয় শঙ্কর মাছের লম্বা লেজ
যে যার নৌকোয় ফিরে গেছে শুধু অর্থহীন আষগন্ধ রেখে।"[২৪]

আপন কবি-মানস প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদের বক্তব্য, "আমি থেকেই শিল্পের উৎসার। তারপর আসে 'আমরা'। নিজে যখন পরিকীর্ণ ঘটনা বা দৃশ্যটির অবস্থাটিকে অনুভবে পাই, তখনই একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে বহুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন। যে কোনো অবস্থানই প্রথমে Subjective ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরে ক্রমশ Objective অথবা নৈর্ব্যক্তিকতায় স্থানান্তরিত হতে থাকে। আসলে 'আমি' এবং 'আমার' অস্তিত্ববোধ সবচেয়ে বাস্তব। আমার অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় যাপন যাত্রা। আর সেখানেই একজন কবি স্বতন্ত্র, আলাদা, এই শিল্পের উৎসভূমি। 'আমি' ছাড়া 'আমরা'র উপলব্ধি

সোনার পাথরবাটির সামিল। যে কোনো অভিজ্ঞতা আগে আমাকে জাগ্রত করে, নিজস্ব নির্মাণে আসে 'আমি'। তাই সত্তার সজাগ অবস্থা। 'আমরা' হলো জ্ঞানে ও ধারণায় সত্তার এক প্রতিফলিত রূপ।''[২৫]

দেবীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় হেঁটেছেন লোকজীবনের পথে। হাঁটতে হাঁটতে পথের হরেকরকম বাঁক আর পরিবর্তনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। সেই জীবন-সমাজ-মানুষ ও তার নানমুখী বেঁচে থাকার ধরণকে নিয়ে তিনি অসাধারণ কিছু কবিতা লিখেছিলেন তাঁর আটটি কাব্যগ্রন্থে, যেগুলির মধ্যে 'কাগজ দুনিয়ার এক কোনে', 'অগ্রন্থিত কবিতা' ও 'কেবল দেখেছে শিয়রলতা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমগ্র গ্রামবাংলার ভাবজগতের অপূর্ব বিস্তার প্রত্যেকদিনের বাহিত জীবনে কিভাবে সম্ভব হয়, তার আঁকাড়া রূপ ফুটে উঠেছে দেবদাস আচার্যের কবিতায়-

''আমার বাবা সেলাই কল চালান
এবং তাঁর ঘামে ভিজিয়ে দেন রুটি
আমার মা কাঠ-কুটো কুড়িয়ে
জড়ো করেন উনুনের ধারে
তাঁর হাতের শাঁখা-চুড়ির শব্দ হয় টুন-টান
আমাদের টালির ছাদ আর দরমার বেড়া থেকে
একনাগাড়ে সুর উঠছে ঝম ঝম বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি।''[২৬]

অরুণ সান্যাল ১৯৭২ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত যে মিথ-পুরাণের জগতে ছিলেন, সেখান থেকে ১৯৮৯ সালে ফিরে এসেছেন লোকায়ত সংস্কৃতির জগতে। দেশিয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি সংমিশ্রণ ঘটালেন লোককথা এবং ছেলেভুলানো ছড়ার। কাব্যভাষা হয়ে উঠল সহজ-সরল। ব্যক্তি অনুভবের আন্তরিকতায় কথা বলার ভঙ্গিতে প্রকাশ পেল লোকমানসের সাথে কবিমানসের গভীর সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'কায়া নৌকায়' কাব্য গ্রন্থটি। এই কাব্যের একটি কবিতা 'জলের মধ্যে লেখা জোকা'-য় দেখি সেইসব শব্দ যেগুলি লোক-সংস্কৃতির জগতের সন্ধান দেয় -

"না পদ্ম নয়, শাপলা চাকা চাকা
ফুলের বরণ কড়ি ভরেছে কড়াই
নটেশাকের মধ্যে বিউলি বড়ি
ঘড়া বক বক দিঘীতে জল ভরায়
এবং মাদার বনের ফুলেও উলু
গাছতলায় সন্ধ্যা টাপুর টুপুর
গাই বলদে চষলে নাবাল জমি
বাদ্যি নাচায় ডালিম গাছে পরভু
কোন ছবিটির পরেই-বা কোন ছবি
সীতেরামের কাঁকাল ঘেরা ঘুনসি
বিনিসুতোয় মালা গাঁথার শিল্পে ।"

এই কবিতাংশে এমন সব লোকজ উপকরণ রয়েছে- নটেশাক, বিউলি বড়ি, মাদার বন, উলু, নাবাল জমি, ঘড়া, দিঘী, ঘুনসি- যেগুলিতে রয়েছে মিশ্র সংস্কৃতির পরম্পরা। কবি একবার বলেছিলেন, "কবিতা শুধু অনুভূতি নয়, কবিতা লেখার জন্য একজন কবিকে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়, দেখতে হয় পাহাড়, সমুদ্র, ঝরণা, অনেক মানুষ, শহর, পাখিদের ওড়াউড়ি, ফুলের পাপড়ি মেলা, এইসব দেখার স্মৃতি কোনো নির্জন মুহূর্তে কবিতার একটি পংক্তি হয়ে উড়ে আসবে, তারপর কবিতাটি লিখে ফেলো।" (জীবনের আয়নায় / কবিতা সীমান্ত, মে,২০০০)। অরুণ সান্যালের এই কবি-মানসই অন্বিত হয়েছে লোক-মানসের সাথে।

রামবসু ১৯৭২-এ লেখেন 'কানামাছি'। এরপর 'সময়ের কাছে সমুদ্রের কাছে' (১৯৭৯), 'মন্ত্রখুঁজি' (১৯৮১), 'আমি সাক্ষ্য দিই' (১৯৯০), 'সমৃদ্ধ সময়' (১৯৯২)। চল্লিশের দশকে যাঁর কাব্য সাধনার শুরু, অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে তাঁর চরম সিদ্ধিলাভ। সঙ্গত কারণেই ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত রচিত রামবসুর কবিতা আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত।

রামবসুর কবি-মানস প্রসঙ্গে তাঁর কথাতেই বলি, ''সময়ের গ্রন্থিতে নিজেকে আবিষ্কার করা সেটাইতো কবিতার কাজ - অবশ্য আমার কাছে। ব্রতচ্যুত হতে চাই নি। শীতল পেলব পদ রচনাকে কবিতার মোক্ষ বলে ভাবিনি, আজও ভাবিনা। কবিতাকে রক্ষা করার জন্যই কবিতাকে হতে হবে একদিকে রুক্ষ পেষল পাহাড়, অন্যদিকে তাকেই হতে হবে, একই সঙ্গে হতে হবে স্নিগ্ধ ও স্বপ্নময়। কারণ কবিতার অন্বেষণ হল সমগ্রতা।''[২৭] এই সমগ্রতার সন্ধানেই একদিন কবি চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার তারগুনে গ্রাম থেকে কৈশোরের স্বপ্নভূমি ঝাড়খণ্ডের জরাইকেলাকে পেছনে ফেলে কলকাতার মুরারিপুকুর রোডের আবাসনে সাধনা চালিয়েছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সত্তর দশকের রক্তাক্ত দিনগুলি। শিহরণ জাগানো এই দিনগুলি কবি-মানসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, কবিতার কাজ সময় ও সভ্যতার বিকাশে 'সময়ের অর্পিত দায়িত্ব' বহন করা। রামবসু কবিতার এই দায় কোনোদিন অস্বীকার করতে পারেন নি।

লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি কবি রামবসুর ছিল নাড়ির টান। তিনি বিশ্বাস করতেন লোকজ সংস্কৃতির বাতাবরণ যে সাহিত্যে যত বেশি, তার প্রতি মানুষের আকর্ষণও চিরন্তন। একবিংশ শতকের প্রথম দশকে পৌঁছে কবি এই উপলব্ধিতে সুস্থির ছিলেন যে লোকজীবনের সেই আনন্দ স্বরূপে আর প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয় যেখানে-

''দৃষ্টিহীন ঠাকুরদার কণ্ঠে
নামগানের পূত প্রতিধ্বনি বুকে নিয়ে
আমার আঁতুড়ঘর, বসিরহাট মহকুমার
তারাগুনে গ্রাম, সেখানে যে বন্ধুরা এখনো জীবিত
আর গ্রামবাসী, ইছামতী নদী, বাঁশ বাগান
কাকভোরে এস্রাজ বাজিয়ে গ্রামঘোরা
কামার পাড়ার শিল্পী, চালতা তলা, ঝিঁঝিঁ
জল ছুঁই ছুঁই কঞ্চিতে বসা পানকৌড়ি
বড় পুকুরের ধারে বাতাবী লেবু, আমলকি

জোলা পাড়া, পীর সাহেবের দরগা, কালীবাড়ি
একা একা ঘোরা, স্মৃতির আকাশ, গন্ধরাজ
আমার কৈশোরের স্বপ্নভূমি
ঝাড়খণ্ডের জরাইকেলা গ্রাম পলাশ, কুসুম
হাতির শুঁড়ের মতো দোল খাওয়া মহুয়া, করম
সারাণ্ডার শালের অরণ্য, বর্ষার বন্য অলকানন্দ
ফলবতী কোয়েল, সোনা খোঁজাদের তুম্বা
মহিষাসুরের মতো মাথা তোলা বিদ্রোহী পাহাড়
দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করা, অধিবাসী, আদিবাসী
তোমাদের সকলের এ স্বরলিপি।"[২৮]

অতীত দিন ফেরা সম্ভব নয়, কিন্তু পুরোনো দিনের স্মৃতিময়তাও তো কবি-মানস থেকে মুছে যাবার নয়। কারণ এই স্মৃতিতেই রয়েছে আনন্দ-বিশ্বের সন্ধান। যে উপনিবেশ ব্যক্তি শরীর থেকে সমাজ-জীবন - সবকিছু বিড়ম্বিত করেছে তা পারেনি কবির লোক-সংস্কৃতিকে বিনাশ করতে। প্রাণশক্তির দাক্ষিণ্যে প্রবল চাপের তলাতেও বেঁচে রয়েছে লোক-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। প্রকৃতি ও জীবনের প্রতি উন্মুখ হয়ে মানব সমাজের অন্তঃসারটি রামবসু ধরতে পেরেছেন, মানুষের অস্তিত্ব ও তার অন্তঃসারের মধ্যেকার ফাঁকটি সম্পর্কে সচেতন হয়েই তিনি লিখেছিলেন-

"আমি এখনও ভালোবাসি মানুষ,
মানবতা, ভালোবাসি জীর্ণ ছিন্ন স্মৃতি
রঙ ওঠা ছবি।"

('বিষণ্ন অতিথি' / কবিতা সমগ্রের কাছাকাছি / পৃষ্ঠা ১৯৬)।

কবি-মানসই গঠন করে কবি-ব্যক্তিত্বকে। সচেতন ভাবে রামবসু তাঁর মনকে আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন। তিনি সাম্প্রতিক বা বর্তমানের কবি নন। লোক-জীবনের মূল ধারাগুলি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি লিখেছেন -

"নিচে মাটি, নদী, শ্রম, ভালোবাসা, মানুষের মুখ
আশ্চর্য ঐকতানে বিচিত্র মুখর, মুখরিত
রাত্রির হাতে সংজ্ঞাতীত কালের তম্বুরা
বনময় ঝর্ণার গান, পাখির ডাক, নক্ষত্র দৃষ্টি .... ।"[২৯]

মানসিক দিক দিয়ে তিনি লোক-জীবনের প্রতি আবেগ প্রবণ, স্বদেশি ঐতিহ্যে এখনও আস্থাবান-

"এখনো কান পাতলে শুনতে পাই
ঠাকুরদার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নামগান
যেন বর্ষার বাঁশবনে ঝিল্লির অশান্ত শিহরণ
গাছের ডালে ডালে জোনাকির দেওয়ালি ।"[৩০]

লোক-জীবনকে যে বোধগুলি ঐক্যবদ্ধ করেছে সেগুলির বিষয়ে রামবসুর ধারণা ও অভিজ্ঞতা কম ছিল না । তাঁর কবিতায় বার বার পাই লোক-মানসের জয়যাত্রার স্বপ্ন ও ভাবনা । তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও ভালোবাসেন মানুষ, মানবতা, ভালোবাসেন পরাণ মাঝি ও তার গ্রাম বাংলাকে । কবিতায় তিনি বারবার তাঁর কবি-মানসকে তুলে ধরেন এইভাবে-

"....ঋতুচক্র, হালকা ডানার গাংচিল, কোমল পতঙ্গ
আমাদের আনন্দ আর উজ্জীবনের নক্ষত্রময় শষ্যের প্রান্তর
আমরা তো ধারণ করতে পারিনি সেই আদিম অভিজ্ঞান ।"
(কবিতা সমগ্রের কাছাকাছি/'এই আকাঙ্খার দেশ' / পৃষ্ঠা-২০৪)

কবি রাম বসু মনে করেন যে আজকের নতুন ভাবনার দুনিয়ায় মানুষের মনে কবিতার নিজস্ব অভিঘাত সৃষ্টি করতে হলে, মহৎ কাব্য ভাবনায় উজ্জীবিত হতে হলে লোকায়ত ভাবনাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না । তাঁর বিশ্বাস, মুষ্টিমেয় পরিশীলিত নাগরিক মানুষের ও পাঠকের ভাললাগার দেওয়াল চুরমার করে বৃহত্তম লোকসমাজের কাছে কবিতাকে পৌছে দিতে হলে লৌকিক মানসের ভাবনাকে বিতত করে দিতে হবে । কবির কাছে–

"জীবন একটা প্রার্থনা
আমি যেন রাতভর সামনে গুণ টেনে

পৌঁছোতে পারি উৎসে যেখানে আমার
পিতৃপুরুষের ভিটে, আত্মার স্বীকৃতি ।"[৩১]

ফজল শাহাবুদ্দিন বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে একজন । অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে লেখা তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা 'পুরোনো দিনের সন্ধ্যা' । এই কবিতায় রয়েছে লোকজীবনের জয়যাত্রার স্বপ্ন ও ভাবনা --

"বিশাল সূর্যাস্তে দেখি মাতাল কাকের দল রক্তাভ আকাশ ছেয়ে
শব্দের কোরাসে দীপ্ত ফিরে যায় গ্রামে -
কোথাও ছায়ারা নাচে ঘুঘুর ডানায়
আমার সম্পন্ন রঙে, বাঁশবনে
পুকুরের ঘাটে পুষ্পিত কলসে সিক্তবসনে এবং
শরীরের নিঃসঙ্গ উত্থানে ।
কার বিষণ্ন মুখের হাসি আজো মনে পড়ে
কোথায় দুরন্ত সেই কল্লোলিত পদ্মার শরীর ।"

(বাংলাদেশের নির্বাচিত কবিতা ঃ
মহম্মদ নুরুল হুদা সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১১৪)

গ্রামের জীবন-প্রকৃতি-চরিত্রকে কবিতায় প্রশ্রয় দেওয়া, শহুরে ভদ্রলোকের দৃষ্টিতে নয়, গ্রাম-মানুষের শরিক হয়ে তাদের মধ্যে থেকে দেখা, তাদের ভাবনার দোসর হওয়া - কবিতায় এই বিশেষ মাত্রা যোগ করেছেন কবি ফজল শাহাবুদ্দিন ।

বাংলাদেশের সাম্যবাদী কবি মুনীর সিরাজ যখন তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প ব্যবহার করেন তখন তার মধ্যে থাকে স্বদেশি ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা ও লোক-জীবনের প্রতি আবেগ প্রবণতা । যে বোধগুলি লোক-জীবনকে ঐক্যবদ্ধ করে সেগুলির বিষয়ে কবির ধারণা ও অভিজ্ঞতা যে কম ছিল না তার প্রমাণ রয়েছে নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশে —

"ভোরের ফুলের, সেই দিন ঘরের ঘরে ধান ।
কেটে গেল তিরিশ বছর
তারো আগে কিংবা তারো পরে-
ইছামতি নদী তীরে সূর্য ওঠে নামে প্রতিদিন,

রাঙা মেঘ ভেসে যায়, লালপাখি গান গায়,
সেই পাখি জন্মাবেই তিরিশ বছরে
তারো আগে কিংবা তারো পরে ।''

(বাংলাদেশের নির্বাচিত কবিতা / 'লালপাখি',
মনীর সিরাজ, পৃষ্ঠা ২১৪)

কবি আল মাহমুদের একথা অজানা ছিলনা যে লোকজীবন থেকেই উঠে এসেছে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান । কবি যখন লেখেন -

''হে গর্ভধারিনী মাটি,
আষাঢ় বর্ষণে আজ হঠাৎ কি মনে পড়ে তোমার প্রথম পুত্রকে ?
বৃষ্টির ধোঁয়ায় কাঁপা কান্না হয়ে গেল
বাংলার ঝিঁঝির ঝংকার !
যে বাড়ে গাছে মতো ।
কদম্বের কাণ্ড যেন নদীর কিনারে ।
পুদিনার ঝোপে দেখি ছেয়ে গেছে জন্মের শূণ্য ভিটেমাটি
পড়ে আছে ভাঙা চুড়ি, শূন্য হাঁড়ি, দর্পণের কাঁচ
পাখির বিষ্ঠায় ভরা নারকেলের শিখায় এখন
শকুন-সম্রাট বসে আহারান্তে, নিশ্চিন্তে ঝিমোয় ।
আজ সবই জরাজীর্ণ । কোথাও গুঞ্জন নেই ।''

('জন্মদিন' / শ্রেষ্ঠ কবিতা / পৃষ্ঠা ১৬২)

তখন তাঁর কবিতায় বার বার পাই গ্রাম-জীবনের স্বপ্ন ও ভাবনা । কবি জেনেছেন সেই জল-হাওয়া-মাটিকে যাকে আশ্রয় করে তিনি বড় হয়েছেন, যে মাটিকে 'গর্ভধারিনী' বলে মেনে, তাকে যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের পবিত্রতীর্থ মনে করে সেই গ্রাম-পরিবেশের নানা উপকরণ কবিতায় বিকশিত করেছেন । কবি যেন এখানে দ্বিতীয় বিধাতা । সর্বন্ধর প্রতিভার শক্তিতে মাটি-মানুষের জীবন ও অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে অনেক অনেক কোহিনূর সংগ্রহ করে তাঁর কবিতা-কায়াকে উজ্জ্বল করেছেন । কবি আল মাহমুদ জানতেন,

জলে না নামলে যেমন সাঁতার শেখা যায়না, তেমনি 'লোক জীবন' ও নিসর্গ প্রকৃতির কাছে না গেলে লোকায়তকে কবিতায় আনা যায়না । কবির কাজ যদি জীবনে জীবন যোগ করা হয়, তাহলে জীবনরস পান করে, সমগ্র জীবন পরিচয়ের সঙ্গে নিজের দেখা-শোনা-জানা-বোঝাকে মিলিয়ে নিয়ে যে সত্য লাভ করেছেন তাকেই কবিতায় পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন । কবি এক জায়গায় বলেছেন "....প্রত্যেক বিজয়ীদের জন্য থাকে পুরস্কার । এমন কি আহত, পঙ্গুদের বুকেও সান্ত্বনার পদক ঝলকায় । চিরকালই বীরত্বের বিনিময়ে এরকম রেওয়াজ রয়েছে । কিন্তু একজন কবিকে কী দেবে তোমরা ? যে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে বিষণ্ন বদনে ? অঙ্গুলি হেলনে যার নিসর্গও ফেটে যায় 'নদীর ধারায়', উচ্চারণে কাঁপে মাঠ, ছত্রভঙ্গ মিছিল, পাক খেয়ে এক হয়ে যায় ?"[৩২] - এর উত্তর আমাদের কাছে নেই । আমরা শুধু বলব, আল মাহমুদ সেই জগতের প্রতিভূ যে জগৎ ভরে উঠেছে ধ্বনি-গন্ধ-বর্ণের অজস্র আভাস নিয়ে ।

লোকজীবন প্রীতিতে অভিনিষিক্ত হয়ে বাংলাদেশের কবি অনীক মাহমুদ লিখেছেন -

"কুড়ি বছর আগের মতিহারে
ছিল কী আশ্চর্য নবোঢ়া আকাশ,
স্বপ্নের চাদরে ঢেকে মেঘেরা বেড়াতো নীলিমার পথ ধরে
নেমে আসত সাদা কপোতেরা ।"

(কাব্যঃ এইসব ভয়াবহ আরতি কবিতা ঃ 'মেয়েটা'
পৃষ্ঠা ৩৬, রচনাকাল ঃ ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৮)

অনীক মাহমুদের বক্তব্য থেকেই পেয়ে যাই তাঁর কবি-মানসের অকৃত্রিম পরিচয়, "না বুঝে কবিতা লেখা কিংবা কাব্যের মোড়লী করা এক বঞ্চনাকর বিষ, ভয়ানক আত্মরতি ।" তিনি আরও বলেন, "যারা সত্যকে মিথ্যের নির্মোকে রুদ্ধ করে, যাদের হাত প্রসারিত হয় সরীসৃপের মত্ত স্বভাবে, পৃথিবীর ঘাস-তারা-ফুল-সুললিত সুর, নিসর্গ মঞ্জরী যাদের হৃদয়ে জাগাতে পারেনা মায়াবী স্ফুরণ, মজলুমের আর্তস্বর কিংবা অভুক্ত প্রতিবেশী প্রতিদিন যাদের দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়, বিনয়-বদান্য-দয়া ক্রমে বিদ্ধ হয় কাঠিন্য ক্লিন্নতায়,

সুস্থ চেতনার প্রবাহ যতদিন রুদ্ধ হবে নাগিনীর হিংস্রতায় - তোমরা তাদের এড়িয়ে চলো ।''
(এইসব ভয়াবহ আরতি / পৃষ্ঠা ২৯) 'আবাহন' কবিতায় কবিকে বলতে শুনি -

'' যে নদী হারিয়ে ফেলেছে দুর্বার যৌবন,
মাঝির কণ্ঠে আসে না ছাপিয়ে ভাটিয়ালি গান,
নবান্নের আমোদ উল্লসিত হয়না আর রাখালের বাঁশি,
শান্তির সামিয়ানা ওঠে না আর ফুল্ল চেতনায়,
কবিতার শব্দ বল্লরী যারা কেড়ে নিতে চায়
তোমরা তাদের এড়িয়ে চলো ।''

(এইসব ভয়াবহ আরতি / পৃষ্ঠা ২৯)

যে লোক-উপকরণ নিয়ে 'কবিতার শব্দবল্লরী' রচিত হয় তাতে বাধা দেওয়ার অর্থই তো সত্য-শিব-সুন্দরকে আঘাত করা । অনীক মাহমুদের কবি-মানস এই আঘাতের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চান আবাল্য পরিচিতির স্মৃতিবাহিত লোক-জীবনের অজস্র বৃত্তে । কবি-মনের নানা স্তরে বাসা বেঁধে থাকা লোকসংস্কৃতির বিচিত্র অবয়ব লোক-দৃষ্টি কোনো সহজাত ব্যবহারে শুধু বিনির্মিত হয় না, রসসৃষ্টিতে সমর্থ হয় ।

কিন্তু তবুও খেদ রয়ে যায় । খেদ থাকাটাই স্বাভাবিক । কারণ-

''আর নেই বিশ্বাসের তরুমূল ! অনার্দ্র পলাশ
গ্রাম আর গ্রামীণতা উবে গেছে ।
কিংশুক ইচ্ছের লাশ গড্ডলিকা প্রবাহের
টানে ভাসে আজ ।''

(কাব্য ঃ এইসব আরতি / কবিতা ঃ'কালের আময়'
পৃষ্ঠা ১২, রচনাকাল ঃ ৯ মার্চ ১৯৯৩)

অথবা

''মাজন আসক্ত দাদি কিংবা মৃত স্বজনের শোকে

মুহ্যমান কবরের দাদু
সোজন রূপাই দুলী, নকসী কাঁথার মাঠ,
বাদিয়ার ঘাট আর কোনো স্বপ্ন যাদু
আনে না আঁখির পটে ।''

(তদেব)

কারণ -

''টাউটারি বিষবাষ্পে ধূমায়িত বাদাবন ।''

(তদেব)

আঁখিপটে স্বপ্ন-যাদু না আনলেও কবির আছে দায়বদ্ধ দীক্ষা । সেই-

''দায়বদ্ধ দীক্ষার দেয়ালি নিয়ে পথ হাঁটি একা একা
নক্ষত্রে নিঃশ্বাস হয়তো বুঝিনা বায়স
তবু নিজস্ব স্বপ্নের চাঁদ, নীল স্বপ্নের আকাশ
এখনও দেখে যাই স্তব্ধতার দাবানল চিরে ।''

(জননীর প্রতি)

লোক-জীবনকে ঘিরেই কবির নিজস্ব 'স্বপ্নের আকাশে স্বপ্নের চাঁদ' । স্কাইলার্কের মত কবি-মন যতই নীলাকাশে পক্ষ বিস্তার করুক না কেন, কবি তো আর লোক-জীবন বিবিক্ত নন । যে সুপ্রাচীন গ্রামীণ চেতনা ও মূল্যবোধ মানুষকে পরিচালিত করেছিল তা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে যাওয়ায় কবি বেদনাহত হয়েছেন । লোকায়ত জীবনের যিনি প্রেমিক সেই কবির কাছে এ বেদনা স্মৃতি ভারে আরও অসহ হয়ে ওঠে ।

মুহম্মদ আহ্সান উল্লাহর কবিতায় পাই লোকজ নানা উপকরণ-দুধেল গাভী, পুঁথির আসর, চন্ডীপাঠ, পূর্ণফসল মাঠ, পুকুর-নদী-খাল, ভোরের শিশির, কোমল দুর্বা ঘাস, ঈদ-পার্বন ইত্যাদি । 'সে সব সোনার দিন' কবিতায় লিখছেন -

''আম-কাঁঠালে পূর্ণ বাগান জ্যৈষ্ঠ মধুমাসে,
শীত-শরতে ভোরের শিশির দুর্বা-কোমল ঘাসে ।

বারো মাসে তেরো পাবন, বছরে দুই ঈদ
খুশির চোটে পালিয়ে যেত ছেলের চোখের নিদ ।''
(পুলককান্তি ধর সম্পাদিত 'কাব্যস্নান' / পৃষ্ঠা ৫৬)

একদিকে বর্তমান কালের গ্রাম, সমাজ জীবন, অন্যদিকে পুরোনো দিনের সুখ-স্মৃতির আস্বাদন, পুরোনো কালকে ফিরে ফিরে দেখা ও পরিবর্তনের ধারায় সে কাল হারিয়ে যাওয়া কবি-মানসের বেদনা-অনুভবের উৎসারণ ঘটে এইভাবে -

''হায়রে কোথা হারিয়ে গেল সে সব সোনার দিন ।''

মাটির মমত্ব ও মানব মহিমার অপ্রতিরোধ্য টানে আবর্তিত হয়েই কবি লিখেছেন এই ধরণের নস্টালজিক্ কবিতা ।

ওপার বাংলার আর একজন কবি সেলিমা আজিজ । ''গাঁয়ের কথা' কবিতায় তিনি লোকায়ত জীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে-

'গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যেত ছোট্ট নদী ইছামতী,
কাটত সময় গাঁয়ের পথ ধরে,
বকুল গাছের তলায়
মালা গাঁথা হত সকাল বেলায় ।

''এক অর্থে সকল মানুষই একা । অনেকে একাকিত্ব উপলব্ধি করতে অক্ষম, কারো কারো মর্মমূলে তীরের মতো বিঁধে থাকে নৈঃসঙ্গ্যবোধ । তবু আমরা কোনো না কোনো সূত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত । কখনো সেই সম্পর্ক গভীর, কখনো বা উপরিতলে ছুঁয়ে যাওয়া । আমি নিঃসঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও অনেকের সঙ্গে জড়িয়ে আমার জীবন ।'' (পৃষ্ঠা ৭ / পূর্বলেখা) ।

সুদীর্ঘ সময় ধরে শামসুর রহমান বাগ্‌দেবীর পেছনে পেছনে ছুটে চলেছেন । এই দেবীকে অনুসরণ করেই কখনো তিনি পৌঁছে যান স্নিগ্ধ উপত্যকায়, প্রাচীন উদ্যানে, ঝরণা তলায়, আলো ঝলমল টিলায়, কখনো বা চোরাবালিতে । মাঝে মাঝে কবি

অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু কখনো হাল ছাড়েন নি। কোনো একদিন প্রকৃত সিদ্ধির সন্ধান মিলবে এই আশায় তিনি যাত্রা অব্যাহত রাখেন। কবির ভাষায়, "গন্তব্যে পৌঁছাতে পারি আর না-ই পারি, আমার পথ চলতেই আনন্দ। কবিতা লেখার সময়ে কোনো এক রহস্যময় কারণে আমি শুনতে পাই চাবুকের তুখোড় শব্দ, কোনো নারীর আর্তনাদ, একটি মোরগের দৃপ্ত ভঙ্গিমা, কিছু পেয়ারা গাছ, বাগানঘেরা একতলা বাড়ি, একটি মুখচ্ছবি, তুঁতগাছের ডালের কম্পন। যা-কিছু মানুষের প্রিয়-অপ্রিয়, যা-কিছু জড়িত মানব-নিয়তির সঙ্গে সে সব কিছুই আকর্ষণ করে আমাকে, সবচেয়ে বড় কথা, এই চরাচর, মানুষের মুখ, বাঁচার আনন্দ কিংবা যন্ত্রণা সব সময় বন্দনীয় মনে হয় আমার কাছে। আমি তো জীবনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করতে চাই, কুড়িয়ে আনতে চাই পাতালের কালি, তার সকল রহস্যময়তা। যে মানুষ টানেলের বাসিন্দা, যে মানুষ দুঃখিত, একাকী, সে যেমন আমার সহচর তেমনি আমি হাঁটি সেইসব মানুষের ভিড়ে যারা ভবিষ্যতের দিকে মুখ রেখে তৈরি করে মিছিল।" (আমার কবিতা / বিষয় ঃ বাংলাদেশ -বীরেন চন্দ সম্পাদিত / পৃষ্ঠা-৩৩৪)

শামসুর রহমানের কাছে গ্রাম-পরিবেশ কোনো দিন নিষ্প্রাণ বলে মনে হয়নি। নদী-পাথর-আকাশ সবই জীবন দোলায় দোলায়মান কবির কাছে। মানুষের কাছে। মানুষের প্রতি তাঁর গভীর সহনূভূতি এবং অকৃত্রিম ভালোবাসা। এই ভালোবাসার পথ ধরেই তিনি পৌঁছে গেছেন মানুষের অর্ন্তলোকে। এই মানুষগুলির কথা বলতে তাঁর বিশেষ চিন্তাধারার কুটজাল নেই, কোনো কৃত্রিমতা নেই। কবির কাব্য সাহিত্যকর্মে আছে সক্রিয় পর্যবেক্ষণ। তাঁর কবিতায় জল-মাটি-মানুষ এক অপরূপ লাবণ্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। কবির বীক্ষণ স্বতঃস্ফূর্ত বলেই তাঁর কবিতায় ভিড় জমিয়েছে বিচিত্র মানুষ, নম্র-সহজ পল্লী-পরিবেশ, হাসি-কান্নার লোকজ-ভূমি।'একজন জেলে' কবিতায় তাঁকে বলতে শুনি -

"সেই ছেলেবেলা থেকে জলের দিকেই ছিল মন,
জলে গেছে বেলা, মুগ্ধতায় যখন তখন
ছুঁয়েছি সাগরজল আর 'আয় মাছ ধরি আয়'
বলে ভাসিয়েছি ডিঙি নদীতে , রঙিলা দরিয়ায়....

ডাকছে কুটুম পাখি, বউ রাঁধে, মেয়েটা তেঁতুল
খাচ্ছে আর ভাই জাল দিচ্ছে মেলে ... ।
আচ্ছা, আপনারা কেউ দয়া করে আমাকে সঠিক
নামটি বলে দেবেন ?
নিজেকে কী নামে ডাকি ?
আমি কি রসিক দাস, বিশু, জগদীন্দ্র মালো ? নাকি
আলী মৃধা ? সবদর গাজী ?''

নদীমাতৃক গ্রাম কবির কাছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । মৃত্তিকালগ্ন মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অচ্ছেদ্য বন্ধন । শামসুর রহমানের কবিতা বলে দেয় তিনি এমনই এক মানুষ, নিবিড় মমতায়, নিত্য শুভ কামনায় যিনি সজল, দীপ্তদৃষ্ট ।

শহীদ কাদরী ঃ ১৯৭৪ এবং ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের কবি শহীদ কাদরী দুটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন । কাব্যদুটির নাম যথাক্রমে 'অভিবাদন প্রিয়তমা' ও 'কোথাও কোনও ক্রন্দন নেই' । শহীদ কাদরী হতে পারেন একবারে শহুরে কবি, ঢাকা শহরের কবি, ঢাকার নাগরিকতা বলতে যা বোঝায় তা পরিপূর্ণভাবে আছে তাঁর কবিতায়, তবুও তাঁর কবিতা লোক-জীবন ও গ্রাম পরিবেশ বিবর্জিত নয় । তাই তিনি অনায়াসে লিখতে পারেন -

''বৃষ্টি ভেজা একটি কালো কাক
একটি কম্পমান আধ-ভাঙা ডালের
ওপর থেকে কিছুটা কাতর আর কিছুটা
কর্কশ গলায় ডেকে উঠল ... ।''
(কাব্য ঃ ভালবাসার কবিতা 'আজ সারাদিন' / পৃষ্ঠা ৫৭)

কোনো কবি-মানসই চোরাবলিকে আশ্রয় করে কবিতার সৃষ্টি সুখলাভ করতে পারে না । কবির পায়ের তলায় শুধু শক্ত মাটি থাকে না, মনেরও থাকে একটা শক্ত ঠাঁই । তাকে খুজে নিতে হয় । যে কবিমন স্ব-দেশাশ্রিত ও যে কাব্য-ভাবনা লোকজ ঐতিহ্য শুদ্ধ সেই শক্তিই কবিকে দাঁড় করাতে পারে আলোক-ভূমে । এই প্রবাহমান ঐতিহ্যগত সংস্কার লোক-জীবনকে বাদ দিয়ে নয় কখনোই । অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকে যাঁরা ধার করা বোধ ও

আমদানী করা ভাবে কাব্যজগতে মিথ্যাচারণ করেছেন তাঁদের পাশে কালবাহিত ঐতিহ্যরাশিকে শব্দ সমবায় বা ধ্বনিগুচ্ছের অন্বয়ে কিছু কবি রসাস্বাদনের ডালি উপহার দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে, চিরসুন্দরের দেশ এই বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আজকের নয়। নানা পুরোনো ও তুচ্ছমূল্য লৌকিক উপকরণের দ্বারা কবি যে সচল প্রাণময়তার সৃষ্টি করেছেন তা সৃষ্টির দিক দিয়ে ব্যাপক ও অর্থময়। কবি আবু জাফর ওবায়েদুল্লা যখন মা-কে স্মরণ করে লেখেন —

"কুমড়ো ফুলে ফুলে
নুয়ে পড়েছে লতাটা
সজনে ডাঁটায়
ভরে গেছে গাছটা
আর আমি ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি
খোকা, তুই কবে আসবি।"

(বাংলাদেশের নির্বাচিত কবিতা 'কোনো এক মাকে' / পৃষ্ঠা ৯১)

তখন বুঝতে অসুবিধা হয়না, মায়ের ছায়া আমাদের জীবনের চারপাশে অনেককাল ধরে আছে ও থাকবে।

এই প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি সুবিচার নাগরিক মনের দ্বারা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে। আর সেই জন্যেই বোধ হয় বাংলা কবিতায় প্রকৃতির ভূমিকা 'বিশেষকাল সাপেক্ষ' হয়ে উঠছে। বলা বাহুল্য, মানুষের মন কিংবা লোক মানস নিয়ে যে সব কবিতা সুন্দর হয়ে ওঠে, সেখানে প্রকৃতির উপস্থিতি অবাঞ্ছিত হতে পারে না। কারণ, নির্মাণ-বিনির্মাণ-নবনির্মাণে প্রকৃতি ও মানুষকে কবিতা থেকে বাদ দিতে পারেন না কবিরা। এমন একটা সময় ছিল যখন বাংলার কবিরা প্রকৃতিকে শুধুই বীক্ষণ করেছিলেন মুগ্ধ রোমান্টিক দৃষ্টিতে। এরপর কবিরা প্রকৃতিকে দেখলেন সচেতন সত্যের আলোয়। অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের কবিরা প্রকৃতি নিয়ে কবিতা লেখার সময় নিজেদের নতুন মূল্যবোধে সঞ্জীবিত করেছেন। প্রকৃতি লগ্ন মানুষের কথা বলতে গিয়েও কবিদের

লেখনিতে যন্ত্রযুগের চেতনাই শুধু প্রতিফলিত হল না, বর্ধিত হল পাশ্চাত্য শিল্পের নানা প্রকরণ - কিউবিজম, সুররিয়ালিজম, ফেমিনিজম, এক্সপ্রেশনিজম, ডাডাইজম প্রভৃতি । এসবের সাথেই যুক্ত হল যুগোচিত ধ্যান-ধারনা-বিশ্বাস । কবিরা দেখলেন সামাজিক বৈষম্য-বিভেদ বিশৃঙ্খলা-ব্যবধানের ক্রমবর্ধমান রূপ, জীবনের বহুমুখী স্রোতের ঘুর্ণাবর্তে মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা, অনিশ্চয়তার অকুল সমুদ্রে ভাসমান মানুষের আশাহীন অতল অন্ধকার, দুঃখ-কষ্ট-বেদনা-ব্যর্থতায় জীবন ধারণের ক্লান্তি, প্রতিদিনের যান্ত্রিক নিষ্পেষণ । এই মানব প্রকৃতি বীক্ষণ থেকেই কবিকণ্ঠে শোনা গেল, "আমার কলম যেন ভালবাসা ভুলেনা যায় কখনো । ....আমি চাইনা কখনো মানুষের হাতে কেউ শিকল পরাক, চাইনা কখনো ভালবাসা হারিয়ে মানুষ হোক নিঃস্ব-কাঙাল ।" (মহাদেব সাহা / ওপার বাংলা)

ওপার বাংলার কবি মহাদেব সাহার মতো আরো অগণন বাঙালি কবির এই মানবিক উচ্চারণ আমাদের শুধু উজ্জীবিত করেনা, মানবিক বোধে উদ্দীপ্ত করে । কবি মহাদেব সাহা বলেন, "আমি রাত জেগে মানুষের নামের বানান মুখস্থ করতে ভালবাসি । শুধু ভালবাসা পারে ধুয়ে দিতে জীবনের কালি, মুছে দিতে পারে ক্ষতচিহ্ন, সব কালো দাগ ।"[৩৩]

১৯৭২ থেকে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মহাদেব সাহার ছয়টি কাব্য গ্রন্থ লিখেছেন এবং একবিংশ শতকের প্রথম দিকেও তাঁর কলম সক্রিয় । অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের এই কবির আবেগ নির্গলিত হয় বাংলা দেশের জল মাটি হাওয়া রোদে । তাঁর প্রতিটি কাব্যেই আছে প্রকৃতি ও মানুষ । মহাদেব সাহার যে ছয়টি কাব্য গ্রন্থ ১৯৭২ - ১৯৯৯ পর্যন্ত লেখা ---

১। এই গৃহ এই সন্ন্যাস (১৯৭২)

২। প্রেমের কবিতা (১৯৯১)

৩। একা হয়ে যাও (১৯৯৩)

৪। যদুবংশ ধ্বংসের আগে (১৯৯৪)

৫। কোথায় যাই, কার আছে যাই (১৯৯৪)

৬। কে তুমি বিষণ্ন ফুল (১৯৯৯)

- সেই কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে কয়েকটি কবিতাংশ উল্লেখ করে দেখানো যেতে পারে, পল্লীগ্রাম

ও লোকজীবনকে ভালবেসে কবি একাকিত্ব ও বিষাদের মধ্যেও নিজেকে কিভাবে সঞ্জীবিত রাখেন -

১) "ফেলে যেতে হবে এই বাস্তুভিটা, ভদ্রাসন
রাই সরিষার ক্ষেত ।"
(আমাকে কি ফেলে যেতে হবে)

২) "তোমাকে কেমন করে ছেড়ে যাই
ধানক্ষেত, মেঠোপথ,
স্বদেশের সবুজ মানচিত্র
তোমাকে কেমন করে ছেড়ে যাই প্রিয় নদী
প্রিয় ঘাস, ফুল ?"
(তোমাকে যাইনি ছেড়ে)

৩) "আমাকে তুই মাটি দে, মাটি দে
মাটির মমতা দে, মন্ত্র দে .....।"
(মানব এসেছি কাছে)

৪) "কথা হয়েছিল আমি তোমাদের কাছে ফিরে যাবো
রঙিন গোধুলি, উদার আকাশ, ধানক্ষেত্র
কচি দুর্বাঘাস ।"
(আমি কথা রাখতে পারিনি)

৫) "আমি যেন বেঁচে উঠে ঘাসফুল নদীর জীবনে
লতাগুল্মের জীবন থেকে আমি টেনে নিই
সঞ্জীবনী সুধা ।"
(অন্য এক মধুর জীবন)

৬) "বর্ষার জলো ধুয়ে নেবো মলিন জীবন ।"

সময়ের কথা বলতে গিয়ে কবি মহাদের সাহা সময়ের চোরাবিলাতে নিজেকে আটকে রাখেন নি । তুচ্ছতম প্রাত্যহিকতার শরীরে চিরন্তনের স্বপ্ন বুনে দিতে গিয়ে তিনি তাঁর কবিতায় অসংখ্য লোক-উপাদান ব্যবহার করেছেন । লোক-জীবন বর্ণনায় তিনি

আত্মবিশ্বাসী। উদাসীন কবি নন তিনি। তাই তাঁর লোক-জীবন-দর্শনকে তিনি সৃজনমুখী করতে পেরেছিলেন। লোক-জীবনের প্রাণিত চর্যায় তিনি ছিলেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী।

অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের মানুষের নিয়তি এই যে সে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাপে নিয়ত বন্দী। আশঙ্কা আর অচরিতার্থতা তার নিত্য সহচর। এইরকম ফাঁসবন্দী, শর্তবন্দী, শ্রেণিসমাজ পেশার অদ্ভুত বিষম বিন্যাসে বন্দী মানুষ বেঁচে থাকতে চায় লোক-জীবনের নানা উপাদানকে সঙ্গী করে। লোক-বিশ্বাস এইরকম একটা শক্তি যাকে লোক-জীবনের সঞ্জীবনী বলা যায়। সামাজিক বৈষম্য ও বিভেদ-বিশৃঙ্খলার ব্যবধান যত বাড়ছে, জীবনের বহুমুখী স্রোতের ঘূর্ণাবর্তে লোক-জীবনে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক ক্রমশ বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, অনিশ্চয়তার অকূলে ভাসমান লোকায়ত মানুষ যেখানে কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না, দুঃখ-কষ্ট-বেদনা-ব্যর্থতা ও জীবনধারনের ক্লান্তি যেখানে মানুষকে প্রতিদিন নিষ্পেষিত করছে সেখানে শুধু ধর্মবিশ্বাসই নয়, অন্যান্য নানা লোকবিশ্বাসের অঙ্গনে লোকমন সাময়িকভাবে সমস্ত ভুলে গিয়ে সমষ্টিগত সমাজবোধে আপন্ন বিচ্ছিন্নতা দূর করতে চাইছে। বেদনা, ব্যর্থতা ভোলার জন্য তাই লোকজীবনে নানা উৎসব, পূজা, ব্রত এখনওচালু রয়েছে। এখানেই যূথবদ্ধ লোকজীবনের সার্থকতা। ধনীগৃহের সাতপুরুষের পুজো আজকে শুধু পুরোহিতের যান্ত্রিক ঘন্টা নাড়ায় পরিণত হয়েছে। তার প্রাঙ্গণ জনশূন্য প্রায়। বিপন্ন ও পরিত্যক্ত অভিজাত গৃহদেবতা আজ সর্বজনীন গণদেবতায় পরিণত হচ্ছেন। সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের চেতনা ও সংহতি লোক-জীবন ক্ষেত্রে যে বহুকাল টিঁকে থাকে - এই সত্যটি অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের অনেক কবির কাছেই ছিল কাঁচস্বচ্ছ। তাঁই তাদের কবিতায় লোক-মানস উপেক্ষিত থাকেনি।

কমপিউটারে হাজার লোকের এক বছরের হিশেব একদিনে করে ফেলা যায়, কিন্তু হাজার দিনেও একজন সামান্য মানুষের মনের সূক্ষ্ম চিন্তানুচিন্তা ও দুঃখ-বেদনার হিশেব করা যায়না। সমাজের গড়নের ভেতরে তাই সে লোক-মানসিকতার জন্ম দিয়েছে। একদিকে ভেদ-বৈষম্য, বিদ্বেষ-ঘৃণা, অন্যদিকে ধর্ম চিন্তা ও ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস - এই দুই থেকে লোকমানসের মুক্তি নেই কোনোদিনও। জ্ঞান-বিজ্ঞানের

আলোক তো বহুদিন ধরেই লোকমানসে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সেই আলো তো আজও পারেনি লোকমানসের অন্ধকার দূর করতে। আর লোকমানসের কথাই বা বলি কেন, আমাদের সুশিক্ষিত বিজ্ঞানীদেরও দেখি, নরাবতারদের কাছে পরম ভক্তের বেশে বসে থাকতে। সমাজ মানুষের মন বড় বিচিত্র, বড় বৈষম্যময়। তাই এখানে বহু দেবতা, বহুল ধর্ম। সমাজবদ্ধ জীবনের মধ্যে যে সমতা-অসমতা, অবিচার-সুবিচার, সুনীতি-দুর্নীতি, সুচিন্তা-কুচিন্তা তা নিত্য নতুন সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। প্রকৃতি বনাম মানুষের সংগ্রাম তো আজকের নয়। কোনো মানুষের পক্ষে রাতারাতি এর সমাধান সূত্র খুঁজে বের করা সম্ভব নয়, কবির পক্ষে তো নয়ই। তবু কবি-মানস লোকমানসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। এই সংযুক্তি যত দৃঢ় হয়, ততই সমাজবদ্ধ, যূথবদ্ধজীবনের গোড়া শক্ত থাকে। এই সমষ্টি জীবনেই আছে লোকধর্মের নানান আচার-অনুষ্ঠান - যেমন শষ্য উৎসব, ব্রতপালন ইত্যাদি। এগুলোতে আছে অধ্যাত্মলোকের রহস্য। কেউ বলে রহস্য নয়, কুয়াশা। বিজ্ঞান বা শিক্ষার অগ্রগতি অধ্যাত্মলোকের রহস্য-কুয়াশার সবটা দূর করতে পারেনা কখনোই। তা যদি পারত তাহলে বিজ্ঞানোন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলোয় চার্চের প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়ত না। বিজ্ঞান ও শিক্ষার অগ্রগতি হলেই যদি ধর্মবিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ সম্ভব হত তাহলে পৃথিবীর সব দেশেই ধর্মাচরণের রূপ ক্রমেই উগ্রতর হত না। আমেরিকান সমাজে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র ভারতীয় সমাজের মত বিকট নয়। অথচ সেখানেও বেগে বইছে ধর্মের জোয়ার। এখানেই লোকমানসের বৈশিষ্ট্য, এখানেই লোকায়ত সমাজের মানস সম্পর্ক।

লোক ধর্মাচরণে যে ভয়-বিশ্বাস-রহস্য অনাদিকালের উৎস তাতে রয়েছে ব্যক্তিমানসের বেদনা-নৈরাশ্য। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এগুলো ব্যক্তিক হলেও সমাজবদ্ধ মানুষের নিভৃততম ব্যক্তিক বিষয়টিও একেবারে সামাজিক সম্পর্কশূন্য নয়। লোকমানস মণিকোঠায় সূক্ষ্মতম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও বর্হিজগতের বা সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতেই সৃষ্টি হয়। সমাজের গড়নের ওপর মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক এবং মানবিক সম্পর্ক নির্ভর করে। আজ টেকনোলজির ভোজবাজি দেখিয়েও লোকমনের দুঃখ-বেদনা, নৈরাশ্য-বিষণ্নতা, হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণা-বিহ্বলতা দূর করা যাচ্ছে না। কারণ

লোকমানসের দূরত্ব আজ খুব বেড়ে গেছে। তাই মানব-মন ক্রমাগত আশ্রয়ের অন্বেষণ করে চলেছে। এই কারণেই সংঘবদ্ধ ভক্তি প্রকাশের প্রবণতা খুব বেড়ে গেছে মন্দির-মসজিদ-গির্জা-গুরুদোয়ারায়।

এই সামাজিক অবস্থায় বিশ শতকের অন্ত্যলগ্নে কবি-মানস যদি লোক-মানসের কাছে আনন্দ ও শান্তির সন্ধান করে, আশ্রয় খোঁজে, তাহলে মানসিক টানমুক্তির প্রতীকী উপাদান কবিতা-দেবতার কাছে নয়, মানুষের কাছেই। কবিতায় যদি প্রীতি-সহানুভূতি বঞ্চিত মানুষেরা খুঁজে পায় বাঁচার রসদ, তাহলে যুগ-যুগান্ত ধরে বেঁচে থাকুক কবিতা শক্তি-সীমায়, বুদ্ধি-দিগন্তে। লোক-মানসের অর্ধেক আকাশে কবি-মানসের অর্ধেক আকাশ মিলিত হোক। লোক-মানসে কবি-মানসের আনাগোনা এই অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের প্রখর দ্বিপ্রহরে অব্যাহত থাকুক।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়টা ছিল সামাজিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি-যাঁরা শিল্প-সংস্কৃতি বা সাহিত্যের চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন তাঁদের পক্ষে এই বিশেষ সময়টা এক ঘোর অন্ধকার সময়। ঠিক যে সময়টার দিন বদলের স্বপ্ন ফিকে হয়ে আসছে, মুলধারার বামপন্থীরা একটু একটু করে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বৃত্তে আটকে পড়তে আরম্ভ করেছেন, সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবাংলার এক নৈরাজ্যের চেহারা, আমজনতার মধ্যে একরকম হতাশার বেদনা, সংশয়, দ্বিধা, সর্বোপরি এক গভীর নাস্তিকতা। সেই সময়েও অনেক কবি কথা বলেছেন পরম আত্মগত আস্তিকতায়, তাঁদের অনেকেই আবার পারেননি লোক-ঐতিহ্যলালিত মানসিকতাকে এক বিশেষ সময়ের চোরাবালিতে বিসর্জন দিতে। তাঁদের অনেকেই সমকালীন লোক-ঐহিহ্যকে, লালিত জীবনকে নেতিবাচক বলে ভাবতে পারেননি। জীবন তাঁদের কাছে শুধুই নঞর্থক ছিল না, সদর্থক ছিল। এই কবিদের অনেকেই ছিলেন যথার্থ রূপকার। তাঁরা ধ্বংস ও অবক্ষয় জনিত হতাশাকেই জীবনের একমাত্র সত্য বলে মনে করেন নি। তাই তাঁদের কবি-মানস সঞ্জীবিত হয়েছিল শুভবোধের অমৃতস্পর্শে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, "পথ ছেড়ে দিতে হবে শুভময় অন্তরে যাবার।" এই কারণে তাঁরা মৃত্তিকালগ্ন লোকজীবনের মধ্যেই সন্ধান করেছিলেন 'অন্য লোকালয়', 'এক পৃথিবীর মধ্যে অন্য পৃথিবী'। এই কবিরা তাঁদের অনভিপ্রেত জগৎ

থেকে, 'কপাট ঘেরা জীবন' থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, নিজস্ব মুদ্রায় চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন লোক-আলয়, 'মাঠের সবুজ' । লোকজীবনেই সব-ক্লান্তি রেখে তাঁরা দু-দণ্ড শান্তি পেতে চেয়েছিলেন । যদি কোনো তরুমূলে শান্ত-শ্যামল আশ্রয় পাওয়া যায়, যদি কোনো সবুজ ঘেরা-লোকালয়ে একটি হৃদয় খুঁজে পাওয়া যায়, তবে ''সেখানেই সব ক্লান্তি রেখে বসে পড়তে চাই, নড়ি না কোথাও ।'' এই বাসনাই অন্ত্যলগ্ন বিশ শতকের অনেক কবিকে নিয়ে গেছে লোকায়ত জীবনে ।

তথ্যসূত্র ও ঋণস্বীকার

১. বিপ্লব মাজী ঃ পোস্ট মডার্নিজম ঃ সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত (পৃষ্ঠা ১৫১ -১৫২)

২. আলোক সোম ঃ কাব্য - 'এই দেশ দারু হরিদ্রার' / কবিতা 'অদ্বৈতবাদ' ।

৩. মল্লিকা সেনগুপ্ত / কাব্য ঃ 'অর্ধেক পৃথিবী' কবিতা ঃ 'মল্লিকা' ।

৪. বিপুল চক্রবর্তী -- কাব্য ঃ 'তোর মুখ দেখতে চাই' / কবিতা ঃ 'সে দিনকে সামনে রেখে' ।

৫. ভাস্কর চক্রবর্তী - শ্রেষ্ঠ কবিতা / 'রাত্রি' ।

৬. ভাস্কর চক্রবর্তী - 'শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা' / কবিতা ঃ পুরোনো কাগজের মালা ।

৭. দেবারতি মিত্র / ভূমিকা ঃ কবিতা সমগ্র ।

৮. পবিত্র মুখোপাধ্যায় / 'পঁচিশে বৈশাখ দিল ডাক' - ১৪০৪ ।

৯. বীতশোক ভট্টাচার্য / কবিতা সংগ্রহ / 'যাত্রা' ।

১০. মনীন্দ্র গুপ্ত -শ্রেষ্ঠ কবিতা / ভূমিকা / পৃষ্ঠা - ৮ ।

১১. মনীন্দ্র গুপ্ত -শ্রেষ্ঠ কবিতা / ভূমিকা / পৃষ্ঠা - ৮ ।

১২. মনীন্দ্র গুপ্ত - 'ব্রহ্মসূত্র' (শ্রেষ্ঠ কবিতা) পৃষ্ঠা - ১১৩ ।

১৩. মনীন্দ্র গুপ্ত -শ্রেষ্ঠ কবিতা / ভূমিকা / পৃষ্ঠা - ৮ ।

১৪. সুবল সামন্ত সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা' (২য় খণ্ড) / পৃষ্ঠা - ৯ ।

১৫. সুবল সামন্ত সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা' (২য় খণ্ড) / পৃষ্ঠা -২২ ।

১৬. সুবল সামন্ত সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা ঃ সৃষ্টি ও স্রষ্টা' (২য় খণ্ড) / পৃষ্ঠা -৩১ ।

১৭. অরুণ মিত্র ঃ 'বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন ও আধুনিক কবিতা' / শিলাদিত্য, ১৬ - ৩০ জুন, ১৯৮৩ ।

১৮. অশোক কুমার মিত্র ঃ 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা' (১৯০১-২০০০) / পৃষ্ঠা-২৫৭ ।

১৯. বীরেন চন্দ সম্পাদিত - 'বিষয় ঃ বাংলাদেশ' / পৃষ্ঠা ৩৩৪ ।

২০. আল মাহমুদ - আমার কথা / 'বিষয় ঃ বাংলাদেশ' ঃ সম্পাদনা - বীরেন চন্দ / পৃষ্ঠা ৩৩৭ ।

২১. দেবাংশু ঘোষ সম্পাদিত - রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বৈচিত্র / প্রবন্ধ - 'সমীর রায়ের কবিতায় লোকায়ত ভাবনা / পৃষ্ঠা ২৪১ থেকে উদ্ধৃত। কবিতা ঃ 'আমি তো যেতেই পারি, যাবো'।

২২. রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বৈচিত্র - দেবাংশু ঘোষ সম্পাদিত, প্রবন্ধ ঃ সমীর রায়ের কবিতায় লোকায়ত ভাবনা - দিব্যজ্যোতি মজুমদার / পৃষ্ঠা ২৩৯।

২৩. তদেব ঃ পৃষ্ঠা ২৩৯।

২৪. দিব্যজ্যোতি সম্পাদিত - কাব্য ঃ কেবল দেখেছে শিয়রলতা / কবিতা - 'ধুলোর গড় এঁকে'।

২৫. রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বৈচিত্র - দেবাংশু ঘোষ সম্পাদিত। শুভ্রব্রত চক্রবর্তীর প্রবন্ধ / পৃষ্ঠা ২২৩-২২৪।

২৬. রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বৈচিত্র - দেবাংশু ঘোষ সম্পাদিত , (পৃষ্ঠা ২৫১)।

২৭. রাম বসু - কবিতা সমগ্রের কাছাকাছি / (পৃষ্ঠা VII, XI)

২৮. রাম বসু - কবিতা সমগ্রের কাছাকাছি / উৎসর্গ পৃষ্ঠার কবিতা।

২৯. কাব্য ঃ সময়ের কাছে সমুদ্রের কাছে - রাম বসু, কবিতা ঃ 'আহত পাহাড়'।

৩০. রাম বসু - মন্ত্র খুঁজি / 'ভাবনা'।

৩১. রাম বসু - মন্ত্র খুঁজি / 'ভাবনা'।

৩২. সোনালী কাবিন / আল মাহমুদ / পৃষ্ঠা ৬৩।

৩৩. ওপার বাংলার কবি ও কবিতা - তরুণ মুখোপাধ্যায় / পৃষ্ঠা ৫৮ - ৫৯।